মাস্টার প্ল্যান

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

বাতিঘর প্রকাশনী

মাস্টার প্ল্যান

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

Master Plan

Copyright©2016 by Pranto Ghose Dostidar

স্বত্ব © প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

উৎসর্গ :

দীপায়ন ভদ্রকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

রাত ০২ : ৪৭

কাছেই বসে থাকা সাত জোড়া নির্ঘুম চোখ নিষ্পলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওরা গভিরভাবে কিছু একটা আশা করছে, কিন্তু যা চাইছে তা আমার পক্ষে আদৌও করা সম্ভব কি-না জানি না। জানতে চাইও না।

একটা গোল টেবিলের একপাশে কাঠের চেয়ারে বসে আছি, নিশ্চুপ নির্বিকার। চেয়ারের ডানদিকের হাতলটা নেই। কোনও এক অজ্ঞাত কারনে সেটা অনুপস্থিত। আমার পুরো শরীরের ভর বামহাতের উপর দিয়ে কোনোক্রমে তাই ভারসাম্য রাখতে হচ্ছে। টেবিলেও হয়তো হেলান দেওয়া যেত, কিন্তু সেটা করতে ইচ্ছে করছে না। ভয় করছে মানুষগুলোর চোখে চোখ রাখতে, অথবা সঙ্কোচ হচ্ছে, সঠিক বুঝতে পারছি না কোন অনুভূতিটা জোরালো। তার থেকে বরং এভাবেই ভালো।

ঘরের একমাত্র দেয়াল ঘড়ি থেকে ভেসে আসা একটানা টিক টিক শব্দটাও এখন আর সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছে করছে সেটাকে আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলি। একটা সুদৃশ্য শো-পিসে সাজানো শো-কেসের দু-হাত উপরে দেয়ালে সেঁটে আছে ঘড়িটা। ওখানের চকচক করতে থাকা সবগুলো শো-পিসও একটা একটা করে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু, সেসব কিছুই এখন করা সম্ভব নয়, সব সময় সব কিছু করে ওঠার ক্ষমতা মানুষের নেই।

আর মাত্র চল্লিশ মিনিট, এরমধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কঠিন একটা সিদ্ধান্ত, যেটার ব্যাপারে টেবিলের চতুর্দিকে গোল হয়ে বসে থাকা সাতজনের কেউই কিছু জানে না। কিংবা আমিই ভুল ভাবছি, ওদের কেউ কেউ হয়তো এরমধ্যেই আন্দাজ করে ফেলেছে গোপন অভিসন্ধি! কিন্তু, কাজটা ঠিক কীভাবে করবো সেটা নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না। কারণ আমি নিজেই জানি না । কাজটা যে করেই হোক করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

যদিও একভাবে দেখতে গেলে আত্মহত্যা একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। এটা করতে দৃঢ় মানসিকতার প্রয়োজন, সেই সাথে হয়তো পাগলামিও থাকতে হয় কিছুটা। দুটোরই ঘাটতি আছে আমার স্বভাবে। কিন্তু এইমাত্র একটা মজার ব্যাপার আবিষ্কার করেছি, একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারলে কাজটা আর তত কঠিন থাকে না, তখন সেটা বহুমুখি ধাঁধার মতো মনে হয়, যেখানে গন্তব্য আর যাত্রা শুরুর স্থান নির্দিষ্ট, আর এই দুটোর মাঝখানে আছে অনেকগুলো গোলকধাঁধার মতো পথ। আত্মহত্যার এক একটি উপায় হচ্ছে এক একটি পথ, এই পথগুলোর মধ্য থেকে সঠিক পথটি খুঁজে বের করতে পারলেই ধাঁধাটির সমাধান হয়ে যাবে। তখন লক্ষ্য থেকে গন্তব্যে পৌছানো হয়ে যাবে পানির মতই সহজ।

পানি! হ্যা, পানি! সহসাই অনুভব করলাম প্রচুর তেষ্টা পেয়েছে। সামনে থাকা দুটো কাঁচের গ্লাসের মধ্যে থেকে যেটা একটু বেশি পরিষ্কার সেটা তুলে নিলাম বামহাতে। ডান হাতে প্লাস্টিকের জগটা ধরে শান্তভাবে গ্লাসটা পানিতে ভরে ফেললাম, সাতজন মানুষ নিবিড়ভাবে সেটা দেখল। প্রতি ঢোক পানির সাথে আমার কণ্ঠনালীর ওঠা নামার বিষয়টিও তারা যেন অসীম কৌতুহল নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল। মাঝে মধ্যে মানুষের অহেতুক কৌতুহলের কোনও যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাই না। তবে মানুষ অদ্ভুত জীব, তারা যেমন সবকিছু থেকে একটা কারণ খুঁজে বের করতে চায়, তেমনি অকারনেও অনেক কিছুই করে ফেলতে পারে। আমি পুরোপুরি অকারনেই হাতের গ্লাসটা মাটিতে আছাড়ে ভেঙে ফেললাম। সবাই হতবাক হয়ে গ্লাসের ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। অজান্তেই একটা অপ্রকৃতস্থ হাসি দিলাম।

কথায় আছে, আত্মহত্যা মহাপাপ! কে জানে এই সিদ্ধান্ত বোকার মতো কে দুম করে চাপিয়ে দিয়ে গেছে মানুষের ঘাড়ে! আসলে পুরো ব্যাপারটাই আপেক্ষিক; পৃথিবীতে পাপ-পূণ্য, ভাল-মন্দ পুরোটাই আপেক্ষিক। সত্যি শুধু জন্ম এবং মৃত্যু, আর মাঝখানের পুরো অধ্যায়টাই নড়বড়ে বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে যেটা কারও জন্য ভাল, সেটাই আরেকজনের জন্য হয়তো মন্দ। আবার যেটা কারও জন্য পাপ সেটাই আবার আরেকজনের অবশ্য কর্তব্য। আর এ সবগুলোকে হয় বরণ করে অথবা পাশ কাটিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। মানবজাতি ভুল-সঠিক কিছুই বোঝে না, বুঝতে চায়ও না; শুধু বাঁচতে ভালবাসে। আমিও মনুষ্য ধর্ম পালন করে জীবনকেই ভালবেসে এসেছি, একদম নিখাঁদভাবে। কিন্তু জীবনের আরও অসংখ্য খসে যাওয়া ভালবাসার মতো কিছুক্ষণ পরে এটাকেও ত্যাগ করতে হবে। সেজন্য অবশ্য বিশেষ দুঃখ হচ্ছে না, শুধু একটা হতাশা কাজ করছে। কারণ জীবনের প্রতিটি লক্ষ্য, প্রতিটি পরিশ্রম আর কিছুক্ষনের মধ্যেই নিরেট অর্থহীনতায় পরিনত হবে। পরিশেষে থেকে যাবে আমার নিঃসাড় প্রাণহীন দেহটা।

অনেকক্ষণ হেলান দিয়ে থাকায় বাম কনুইতে ভীষণ ব্যথা করছে, কাঁধের কাছটাও অবশ হয়ে এসেছে। একনাগাড়ে মৃত্যু বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার ফলে মাথার ডান দিকটাও চিন চিন করছে, মনে হচ্ছে খুলির ভেতরে কে যেন একটা আলপিন দিয়ে তীব্র খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্কের কোষগুলোতে। আরও ঘণ্টাদুয়েক এভাবে বসে চিন্তা-ভাবনায় করতে পারলে আপনা আপনি এই যন্ত্রণাই মৃত্যু যন্ত্রণায় বদলে যাবে। কিন্তু, এভাবে ভাবার কোনও মানেই হয় না, আমার হাতে দু-ঘণ্টা সময় নেই, আছে মাত্র চল্লিশ মিনিট। এরমধ্যেই ভেবে বের করতে হবে একটি নিশ্চিত উপায়। আর সেই উপায় কাজে লাগিয়ে সব চিন্তা-চেতনা শেষ করে দিতে হবে। এরপর আমার অস্তিত্বটুকু সব বিচার বিবেচনার উর্ধ্বে গিয়ে বিলীন হয়ে যাবে, চিরতরে।

BanglaBook.org

পূর্বসূত্র

১
সময় : সকাল ১০ : ১২

মাইক্রোবাসের একদম শেষ কোনায় ঠাসা-ঠাসি করে বসেছি। গাড়িতে আরও পাঁচজন আছে। যাদের মধ্যে একজন ড্রাইভার, আর বাকি চার জন হচ্ছে রাহাত, শুমেল, রঞ্জন আর কালু। আমরা সহকর্মি, কাজে যাচ্ছি, একসঙ্গে।

রাহাতের পরনে সবুজ কালারের টি-শার্ট আর পকেটবহুল গ্যাবারডিনের প্যান্ট। আমাদের ছোট্ট দলটাতে ওর চেহারাই সব থেকে সুন্দর, একদম যেন রাজপুত্রের মতো। দুয়েকবার সিনেমাতে অভিনয় করার জন্য পরিচালকের সাথে যোগাযোগের চেষ্টাও করেছিল কিন্তু পরিচালকদের সেই এক কথা, গোঁফ লাগবে! গোঁফ ছাড়া নাকি হিরো হওয়া যায় না, তাতে নাকি পাবলিক খাবে না! যদিও সাধারণ ধ্যান ধারণা যা বলে তাতে মনে হয় আমরা বড় পর্দার বুকে হিরোদের দেখি শুধুমাত্র, তাদের খাই না; কিন্তু পরিচালক যখন নিজে খাওয়ার কথা বলেন তখন তো আর বিতর্ক চলে না।

রাহাত কয়েকবার এই আব্দার শোনার পর সিনেমা করার আশা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ গোঁফের ব্যাপারে ওর ভীষণ অ্যালার্জি আছে। আগে গোঁফ রাখতো ঠিকই, কিন্তু যেবার গোঁফ রাখার অপরাধে প্রথম গার্লফ্রেন্ড ওর সাথে ব্রেক আপ করে ফেলল তখন থেকে এই ব্যাপারে আগ্রহ কমতে শুরু করেছে। এরপরে গোঁফ রেখেছিল দেখে এক চাকরির ইন্টারভিউতেও প্রশ্নকর্তা ওকে যা-তা বলে অপমান করল। দুর্ভাগ্য! সেই চাকরি না হওয়াতে দ্বিতীয় গার্লফ্রেন্ডও ওকে ছেড়ে চলে গেল। তার পর থেকেই গোঁফকে চিরতরে না বলে দিয়েছে সে। যদিও তাতে এখন পর্যন্ত তেমন ভাল কিছুই ওর লাইফে হয়নি।

ড্রাইভারের ঠিক পাশের সিটে যে ছেলেটি বসে আছে ওর নাম কালু। এটা অবশ্য ওর ডাক নাম। ভালো নামও একটা আছে কিন্তু সেই নামে কেউ ওকে ডাকে না। ওর ভালো নাম হল 'কালাম লস্কর লুথার,' ধর্মে খ্রিস্টান। স্বভাবতই এত বড় নামে কেউ ডাকতে পছন্দ করত না, প্রথমে শুধু 'লুথার' বলেই ডাকত। যখন সে ছোট, সবেমাত্র কলেজে উঠেছে, তখন পাড়ার এক ছিঁচকে ফুলপড়ুয়া ছেলে মাথা খাটিয়ে ওর নামের তিন অংশের প্রথম তিন অক্ষর জুড়ে দিয়ে এই নাম আবিষ্কার করে ফেলল। প্রথমে কালু পোলাপানের দুষ্টামি ভেবে এটা হজম করে নিয়েছিল। যখন এভাবে কিছুদিন চলার পরে পাড়ার অন্য ছেলেরা এমনকী বাচ্চা মেয়েরাও পর্যন্ত

BanglaBook.org

ওকে এই নামে ডাকতে শুরু করলো, তখন কাল্লু ক্ষেপে গিয়ে ওই ছিঁচকে ছেলেকে একদিন পাড়ার কবরস্থানের চিপায় নিয়ে বেদম মার মেরেছিল। এই মারামারি কাল্লু যে ফলের আশায় করেছিল হলো তার ঠিক উল্টো। ওই ছেলের ভাই বড় মাস্তান ছিল, পরের দিনই ট্রাকে করে লোক নিয়ে এসে সে কাল্লুকে ধরে নিয়ে গেল। এরপর প্রায় তিন দিন ওকে মেরে মেরে একদম মৃতপ্রায় করে চার দিনের মাথায় বাসার সামনে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে গেছিল। তার পর থেকে কাল্লু আর কখনও অভিযোগ করেনি ওর নাম নিয়ে। কেউ নাম জানতে চাইলে হাসি মুখেই নিজেকে কাল্লু বলে পরিচয় দেয়।

মাইক্রোর মাঝামাঝি সারির সিট দুটোতে পাশাপাশি বসে আছে দুজন, একজন শুমেল, অপরজন রঞ্জন। প্রথমে শুমেলকে নিয়েই বলি। ওর বাবা বিরাট বড়লোক, দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পপতিদের একজন। বাড়ি-গাড়ি কী নেই ওদের! যা দরকার তার থেকে মনে হয়ে দশ বিশটা বেশিই আছে। জীবনে কোনোদিন শুমেলকে হাত দিয়ে ধরে কোনও কাজ করতে হয়নি, এমনকী খাবারটা খাইয়ে দেওয়ার মত একজন লোকের ব্যবস্থাও ওর বাবা করে রেখেছে। বিশিষ্ট শিল্পপতির একমাত্র ছেলে বলে কথা, তার সুযোগ সুবিধার ধরনও আলাদা! শুমেলের শিল্পপতি বাবার কেবলমাত্র একটাই সমস্যা, সেটা হলো নারী-প্রেম। নামে বেনামে বিবাহে অবিবাহে তার অন্তত ১৫ জন স্ত্রী আছে। এই ঘটনা শুমেল যেদিন জানল, সেদিনের পর বাসা থেকে ওর মন উঠে যেতে শুরু করল। এরপর একদিন আর বাসাতেই থাকার প্রয়োজন মনে করল না ছেলেটা। বাবার সমস্ত টাকা-পয়সা তুচ্ছ করে বেরিয়ে এল পথে। বাবা যে ওকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেননি তা না, বরং এখনও তিনি মাঝে মধ্যে সেই চেষ্টা করেন। কিন্তু শুমেল একাগ্র ছেলে, ওর এক কথা, ওই জঘন্য মনের মানুষটার সাথে আর একসাথে থাকতে পারবে না। তাই আমাদের সাথে আছে। কতটা ভাল আছে তা জানি না, তবে ভাল থাকার ভূমিকায় দারুন অভিনয় করে যাচ্ছে।

শুমেলের পাশে বসে যে ছেলেটা এখন ডানদিকের জানালা দিয়ে মাথা বাইরে নিয়ে বাতাস খাচ্ছে, সে রঞ্জন। রঞ্জন আমাদের ছোট দলটার প্রভুর মতো। যাকে সহজ ইংরেজিতে বলে টিম লিডার, আর প্রাঞ্জল বাংলাতে 'দলপতি'। একসময় খুব নাম করা ছাত্র ছিল ও। নামকরা ছাত্র বলার যথেষ্ট কারণ আছে। পত্রিকায় বহুবার কৃতি ছাত্র হিসেবে ওর ছবি ছাপা হয়েছে, যাকে বলে একদম দাঁত বের করা চকচকে পেপসোডেন্ট হাসি মার্কা ছবি। তাছাড়া বিভিন্ন টক শো'তে গিয়ে পরীক্ষায় কীভাবে ভাল ফলাফল করতে হবে সেই নিয়ে কথাও বলেছে বহুবার। কিন্তু আজ সবই তুচ্ছ অতীত। পরীক্ষায় নম্বর নিয়ে আসাটা যতটা সহজ চাকরি পাওয়াটা তত সহজ নয়, সেটা খুব কঠিনভাবে আবিষ্কার করতে হয়েছিল রঞ্জনকে। কতবার চাকরির লিখিত পরীক্ষায় সেরা নম্বর পেয়েছে, কিন্তু মৌখিকে গিয়ে বার বারই বাতিল

BanglaBook.org

হতে হয়েছে। চাকরি পাওয়ার জন্য উপরতলার লোকদের সাথে জানা-শোনা থাকা যে কতটা জরুরি সেটা বোধহয় আজ আর তার থেকে কেউ ভাল জানে না। তাই পরবর্তিতে চাকরির চেষ্টা ছেড়ে নিজেই একটা কাজের চিন্তা করেছে, আমাদেরকেও নিয়েছে সঙ্গে। তাতে অবশ্য এক দিক থেকে বেশ হয়েছে, ওর সাথে আমরাও খেয়ে পরে বেঁচে আছি যে যার মত, স্বাধীনভাবে।

বাদ রইলাম আমি! আমার নাম হিরন। ছোটবেলায় অল্প স্বল্প লেখা-লেখির শখ ছিল, তার থেকেই কীভাবে যেন ভেবে বসলাম, চেষ্টা করলে আমিও বড় হয়ে সাহিত্যিক হতে পারব। তাই আরও লিখলাম, লিখেই চললাম একের পর এক গল্প, কবিতা আর উপন্যাস। বড় হওয়ার পর আবিষ্কার করলাম বাস্তব দুনিয়াটা একটু ভিন্নভাবে ভাবতে চায়। নতুন লেখকের লেখা প্রকাশ করে কোনও প্রকাশক ঝুঁকি নিতে চায় না। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, কেউ পাত্তাই দিলো না। কত প্রকাশকের কাছে লেখা পাঠিয়ে অপেক্ষা করেছি দিনের পর দিন, কোনও উত্তর পাইনি। তারপর এক সময় হাল ছেড়ে দিলাম, ভাবলাম এভাবে জীবন চলতে পারে না। তখনই দেখা হল রাহাতের সাথে, কলেজে আমরা একসাথেই পড়তাম। সেই রাহাতের হাত ধরে রঞ্জনের কর্মি দলে আমার একটা স্থান হয়ে গেল। আজ ওদের কল্যাণেই পথে পথে না ঘুরে খেয়ে পরে বাঁচতে পারছি, নইলে কবেই অনাহারে মরে যেতাম!

গাড়িটা হেলে দুলে চলছে, রঞ্জন একটা জানালা খুলে রাখাতে আলো বাতাসে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। যেটুকু সমস্যা হচ্ছে সেটা পেছনের সিটে ঠাসা ঠাসি করে বসার জন্য। বসতে সমস্যা হবার কথা ছিল না, পেছনের সিটটা দুজন মানুষের বসার মতো যথেষ্ট বড়। সমস্যা করছে আমার আর রাহাতের মাঝে রাখা একটা বড় বাক্স। বাক্সের মধ্যে থাকা জিনিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই ওটার সাথে মানিয়ে নিয়ে বসতে হচ্ছে।

সহসাই ড্রাইভার শার্প টার্ন নিল, পেছনের বাক্সসহ আমি আর রাহাত কেঁপে উঠলাম নিজেদের জায়গাতে। রঞ্জন বেসামাল হয়ে জানালার ফ্রেমে বাড়ি খেল। মাথাটা ডানহাত দিয়ে ডলতে ডলতে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল ও। ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে আর রাহাতকে জিজ্ঞেস করলো, "কি রে, বাক্সটা ঠিক আছে তো?"

রাহাত খানাখন্দময় রাস্তার ঝাঁকুনি খেতে খেতে বলল, "স্যর ঠিক আছে, বস। নো টেনশন।"

এই 'বস' বলাটা হচ্ছে আজকালকার রীতি। রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে অফিসের বড় বড় কর্তা ব্যক্তিরা এই শব্দ ব্যবহার করে। পদমর্যাদায় সিনিয়র কেউ হলেই তার কমন ডাকনাম হচ্ছে 'বস', কেউ কেউ আবার জুনিয়রদেরও 'বস' বলে ঠাট্টা করে। এর সাথে আরও একটা শব্দ আছে কমন, সেটা হলো 'মামা'। বসের

BanglaBook.org

সাথে সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ হলে তবে তাকে অত্যাধিক ভালবেসে কেউ কেউ আবার মামাও বলে। তবে 'মামা' শব্দটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'বস' থেকে স্বাধীন, সেটা যেমন সম্মান করে বলা যায়, সমকক্ষদের বলা যায়, তেমনি তুচ্ছার্থেও ব্যবহার করা যায়।

রঞ্জন গুরুত্ব দিয়ে বলল, "একটু সামলে বস তোরা, বাক্সটা জরুরি, বুঝতেই পারছিস।"

আমাদের সব সময় তুই করেই বলে রঞ্জন, সেটা নিজেকে বস ভেবে নাকি আমাদের ভালোবেসে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। আমরা এই নিয়ে ওকে ঘাটাতে যাই না। মাঝে মধ্যে নিজেকে অন্যের ছায়ায় রাখতে ভাল লাগে, আমরাও তাই করে যাচ্ছি সর্বদা।

রঞ্জনের কথা শুনে সামনের সিটে কাল্লু নড়ে উঠে ড্রাইভারের মাথায় চাটি বসিয়ে দিলো। ড্রাইভার মুহূর্তের জন্য বেসামাল হয়ে পড়ল আকস্মিক আঘাতে, গাড়িটা আবার ব্যাল্যান্স হারিয়ে নড়ে চড়ে গেল। কাল্লু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খিস্তি দিলো, "এই হারামজাদা, ঠিক ঠাক গাড়ি চালাইতে পারস না! ঠিক কইরা চালাবি, নাইলে তোর লাশ ফেইলা দিমু এইহানে!"

রঞ্জন ভ্রুকুটি করে বিরক্তির সাথে কাল্লুকে বলল, "আহ! এত ঝামেলা করার কী আছে, মাথা ঠাণ্ডা কর। ওকে গাড়ি চালাতে দে ঠিকভাবে।"

রঞ্জনের কথা শুনে ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে আরও সাবধানে গাড়ি চালাল। ড্রাইভারের নাম মকবুল মিয়া। এবারেই আমাদের সাথে প্রথম কাজে এসেছে। নিয়মিত ড্রাইভার আব্দুল আজ অসুস্থ, তাই শেষ মুহূর্তে মকবুল মিয়াকে ভাড়া করা হয়েছে, নগদ তিন হাজার টাকার বিনিময়ে। তার কাজ অবশ্য খুব বেশি না, শুধু আমাদের গন্তব্যে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে গাড়ি নিয়ে। এই সামান্য কাজের জন্য টাকাটা যদিও একটু বেশিই, তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে ড্রাইভার জোগাড় হয়েছে সেটাই ভাগ্যের কথা। যদিও আব্দুল নিজে ফোন করে ম্যানেজ না করলে মকবুল মিয়াকে পাওয়া যেত না কাজের জন্য।

শুমেল খুব গম্ভির হয়ে বসে ছিল একটা নতুন ব্রান্ডেড স্মার্টফোন হাতে নিয়ে। সেটার মধ্যে টুক টুক করে গান পাল্টে চলছিল। কাজে যাওয়ার সময় ও সাধারণত কথা বলে না, কেবল গান শোনে হেডফোন কানে লাগিয়ে। আজ গানের তীব্র আওয়াজ হেডফোন হয়ে আবাছা সুরে আমাদের কানেও ভেসে আসছিল, কোনও কারনে একটু বেশিই ভলিউম দিয়ে ফেলেছে শুমেল, তা দিক! কোনও সমস্যা নেই, গান ভাল হলে আমারও শুনতে মন্দ লাগে না।

কাল্লু অধৈর্য হয়ে ড্রাইভারকে বলল, "কী মকবুল মিয়া, আর কতক্ষণ লাগবো তোমার? গাড়ি চালাও নাকি ঠ্যালা দাও বুঝি না?! এইভাবে চললে তো আইজকার মইদ্ধ্যে আর পৌছান লাগতো না।"

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

রঞ্জন আবার কাল্লুকে ঠাণ্ডা গলায় সতর্ক করলো, "তোকে না কতবার বলছি কাজের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখবি! ও ঠিকই গাড়ি চালাচ্ছে," তারপর ড্রাইভারকে বিনয়ী কণ্ঠে বলল, "মকবুল মিয়া, তুমি সাবধানে চালাও, আমাদের কোনও তাড়াহুড়া নেই।"

নীরবে হাসলাম, এই হচ্ছে কাল্লুর প্রধান সমস্যা, ও রাগ নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। তবে কাজে ওর মতো লোকেরও প্রয়োজন আছে, এরা অনেক সময় অনেক অনিশ্চিত কাজ করে বসে। আর আমাদের লাইনে এই জিনিসটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে রঞ্জন আমাদের নেতা; ও অনেক কঠিন পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করতে পারে। সব কাজই পূর্বপরিকল্পিত, গোছানো রাখে; আর এটাই কাজের সাফল্যের জন্য সবথেকে জরুরি গুণ।

কিছুটা সময় পেলে কাল্লু ও রঞ্জনের মৌলিক পার্থক্য নিয়ে আরও খানিকটা ভাবতে পারতাম, কিন্তু চিন্তায় বাঁধ সেধে মকবুল মিয়া গাড়িটা রাস্তার এক পাশে হার্ড ব্রেক কষে থামিয়ে দিলো।

২
সময়: সকাল ১২:২৬

মকবুল মিয়া গাড়িটা থামানোর পর দু'ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। তাকে এখনও ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বরং এই নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো তাকে পাশের এক দোকানে চা আনতে পাঠানো হয়েছে। প্রথমে অবশ্য গাঁইগুঁই করছিল বেশিক্ষণ থাকতে বলা হয়েছে দেখে, কিন্তু প্রাথমিকভাবে কাল্লুর একটা জবরদস্ত ধমক আর তারপর রঞ্জনের বাড়তি এক হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি এখানে থাকার রসদ যুগিয়েছে।

মকবুল মিয়ার নিয়ে আসা দ্বিতীয় চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বাইরের দিকে তাকালাম, জানালা দিয়ে। কিছু দূরেই এক সম্ভ্রান্ত বাড়ির ভারি লোহার দরজার উপর দৃষ্টি স্থির করলাম। সামান্য বিরতি নিয়ে রঞ্জনকে প্রশ্ন করলাম, "বস, এভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকবো? বেলা তো বয়ে যাচ্ছে?"

রঞ্জন আয়েশি ভঙ্গিতে বলল, "হবে, সব হবে। এসব কাজে এত তাড়াহুড়া করতে নেই। মাথা গরম করে ফেললেই বিপদ। বুঝলি!"

রঞ্জনের কথাতে আমল দিয়ে আবারও এক দৃষ্টিতে বাড়িটাকে দেখে চললাম। স্থাপনাটা আয়তনে বেশ বড়সড়। উচ্চতায় তিন তলা সমান, বেশ অনেকটা জমির উপরে স্বতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে প্রচুর গাছপালা। নানা রকম ফুল, ফল; কী নেই সেসব গাছে! তার মধ্যের কতকগুলোর নামও আমার জানা নেই। বাড়ির দেয়ালে বিভিন্ন রকমের রঙের অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয়, তার মধ্যেও রয়েছে রুচিশীলতার ছাপ। দেয়ালের গায়ে হরেক রকমের চিত্র শিল্পের নিদর্শন এই বহুমাত্রিক রঙের ব্যবহারের জন্য কিছু অংশে দায়ি। তবে সেগুলো না থাকলেও বাড়িটাকে আর দশটা সাধারণ বাড়ি থেকে আলাদা করে দেবার মতো বিশেষত্ব সগৌরবে উপস্থিত। গতানুগতিক আয়তাকার নয় বাড়িটি। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, এটাই আমার দেখা প্রথম বাড়ি যেটা পঞ্চভুজের মতো পাঁচ কোণাবিশিষ্ট। প্রতিটি কোনা আবার সমান নয়, এক একটি এক এক আকারের। সমস্ত বাড়ি এবং গাছপালাসহ এলাকাটা লম্বা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের উপরে খোদাই করা অসংখ্য টেরাকোটার ভাস্কর্য, দেখে মনে হয় সেগুলো কোনও ইতিহাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হচ্ছে। শহরের বাইরে এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে তৈরি করা এমন নয়নাভিরাম স্থাপনা আজকাল খুব একটা নজরে পড়ে না। বাড়ির মালিক দেয়ালে কাঁটাতার দিয়ে সৌন্দর্য নষ্ট করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি, শুধু বাইরে আসা আর ভেতরে যাবার জন্য রেখেছেন একটা মাত্র লোহার বড় দরজা। বলা বাহুল্য সেই দরজা মাত্রাতিরিক্ত মজবুত আর বিভিন্ন চিত্রকর্ম দিয়ে বাড়ির দেয়ালের সাথেই সামঞ্জস্য রেখে সুসজ্জিত।

BanglaBook.org

বাড়িটা একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীর। তিনি দেশে ও বিদেশে সমানভাবে সমাদৃত। শিল্পীর নাম বারেক কালিয়ান সংক্ষেপে 'বিকে।' তার আঁকা ছবিগুলোর ডানদিকের নিচের কোনায় ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই খুব সুদৃশ্যভাবে পেঁচিয়ে আঁকা 'বিকে' স্বাক্ষরটি চোখে পড়ে। আর তাতেই এক একটি ছবির দাম হয়ে যায় মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। মানুষ এত টাকা দিয়ে কেন ছবি কেনে তা আমার মাথায় ঠিক ঢোকে না! কোনও দিন ঢুকবে বলেও মনে হয় না।

রাহাত আর শুমেল দুজনে চা খেতে খেতে সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেট ছাড়া নাকি চা পানসে লাগে! সিগারেট খাবার অভ্যাস রাহাতের আগে কখনও ছিল না, এটা শুমেলের বদান্যতা। মানুষের সাথে মিশতে শুরু করলে তার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অনেক সময় নিজের মধ্যে অজান্তেই চলে আসে। কেউ কেউ কথার ভঙ্গি রপ্ত করে, কেউ হাঁটার ভঙ্গি নকল করে, কেউ কেউ আবার কোনও বিশেষ অভ্যাস আপন করে নেয়। রাহাতের ক্ষেত্রে এই অভ্যাসটি হচ্ছে, সিগারেট। আমি সিগারেটের গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারি না, মাঝে মধ্যে ওদের সাথে এটা নিয়ে তর্কও লেগে যায়। কিন্তু আজ তর্ক করব না, তর্ক করলে একতা কমে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে একতার ঘাটতি কাম্য নয়।

রাহাত সিগারেটের ক্ষয়ে আসা টুকরোটা বাইরে ফেলে জিজ্ঞেস করলো, "এই শুমেল, তোর প্যাকেটে আর কয়টা বাকি আছে রে?"

শুমেল না শুনেই উত্তর দিলো, "আর পাঁচ-ছয়টা হবে বোধহয়। কেন, তোর কি শেষ নাকি?"

রাহাত মৃদু দুশ্চিন্তার ভাব নিয়ে বলল, "না ঠিক শেষ না, আর মাত্র দুটো আছে। পাঁচটার মধ্যে কাজ শেষ না হলে সমস্যায় পড়ে যাব।"

শুমেলও রাহাতের কথায় সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়ল, সিগারেট ফুরোলে ওরা দুজনেই সমস্যায় পড়ে যাবে। সিগারেটে যারা আসক্ত, তাদের এই ডোজ ঘন ঘন না পেলে মস্তিষ্ক কাজ করা কমিয়ে দেয়। তখন রাজ্যের দুশ্চিন্তা মাথায় জমাট বাঁধে। তারপর আস্তে আস্তে মস্তিষ্কের যে অংশটা মানবিক যুক্তিবুদ্ধির কাজগুলো পরিচালনা করে সেটা বিভ্রান্ত হয়ে উল্টো পাল্টা সিদ্ধান্ত দিতে শুরু করে, তখন হয় আসল বিপদ!

অপরদিকে সবার মধ্যে কাল্লুই আছে বেশ, রঞ্জনের অনুমতি নিয়ে ঘুম দিয়েছে। ঘুম, এখন থেকে থেকে মৃদু নাকও ডাকছে। গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে মানুষ কীভাবে এত ঘুমাতে পারে কে জানে?! তবে আজকের ঘুমের জন্য কাল্লুকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। বেচারা গতকাল রাত থেকেই নিরলস পরিশ্রম করছে। আজ ভোর পাঁচটার সময় এত বড় বাক্সটা ও নিজেই টেনে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, সেটাও অনেক বড় কাজ ছিল বৈকি!

BanglaBook.org

ওদিকে মকবুল মিয়া ক্রমশ ফেরত যাবার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছে, আব্দুল থাকলে কখনও এমনটা হতো না। কাজের সময় বেশি তাড়াহুড়া করতে নেই, রঞ্জনের এই ফিলোসফি আব্দুল ভাল করেই জানে। কিন্তু মোক্ষম সময়ে তার এমন পেটে ব্যথা শুরু হল যে কোনওভাবেই নিয়ে আসা সম্ভব হলো না। আমি নিজে গিয়ে মানুষটাকে তার বাসার কাছের একটা হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছি। আব্দুলের স্ত্রীর আত্মীয় সেই হাসপাতালের নার্স, তিনিই একটা ভাল কেবিন পাইয়ে দিলেন। রঞ্জনের কথা মত হাসপাতালের ছয় দিনের বিল আগাম আব্দুলের স্ত্রীর হাতে দিয়ে এসেছি। অনেক দিনের কর্মি তাই আব্দুলের চিকিৎসা যাতে ঠিকঠাকভাবে হয় সেটা নিয়ে রঞ্জন যথেষ্ট সচেতন।

মকবুল মিয়ার ঘ্যান-ঘ্যানানিতে চিন্তায় ছেদ পড়ল, সে এখন রঞ্জনের সাথে কথা বলছে। রঞ্জন তার ঠাণ্ডা ভাবটা ধরে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে বলল, "আহা মকবুল মিয়া, আরেকটু অপেক্ষা করো না, তোমার টাকা তো বাড়িয়ে দেবো বলেছি।"

"স্যার, অনেকক্ষণ হয়ে গেল। আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে বলেন তো! আমার বাচ্চাটার জন্মদিন, ওরে নিয়ে একটু পার্কে ঘুরতে যাব ভাবছিলাম," বিরক্তিকর সুরে বলল মকবুল মিয়া।

রাহাত শুনলাম ফিস ফিস করে বলছে, "এই শালার এত তাড়া কীসের! কাল্লুকে দিয়ে আগে ভাগে দুইটা গাট্টা মারিয়ে নিলে ভাল হতো।"

রঞ্জন যদিও রাহাতের মতো রেগে গেল না, সে যুক্তি দিয়ে মকবুল মিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করলো, "আহা! তা যাবে বৈকি, পার্ক তো রাতের বেলাতেও খোলা থাকে। আর আমি তোমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে বলছি না, আর মাত্র এক ঘন্টা সময় দাও, তাহলেই হবে। আচ্ছা যাও, তোমার বাচ্চার জন্মদিনের উপহার বাবদ আরও দু'শ টাকা বেশি দেব। কি, হবে তো?!"

বাড়তি দু'শ টাকার প্রতিশ্রুতি পেয়ে মকবুল মিয়া ফের ক্ষান্ত দিলো। টাকা বড়ই অদ্ভুত জিনিস, মানুষের চরিত্রের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এর থেকে দ্রুত আর কোনও কিছুকে কাজ করতে দেখিনি।

ওদিকে শুমেল সিগারেট শেষ করে আবার গান শোনায় ফিরে গেছে। ওর ভাব দেখে মনে হয় পৃথিবীতে গান শোনার থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই যেন নেই! এমন ভাবসাবের জন্য মাঝে মধ্যে ওকে ধরে প্যাঁদানি দিতে ইচ্ছে হয়। তবে সম্পূর্ণ দোষ ওকেও দেওয়া যায় না। বরাবর আরাম আয়েশের জীবন কাটিয়ে আসার পর রাতারাতি সেটা একদম বদলে ফেলা যাবে এমনটা আশা করা ঠিক না।

BanglaBook.org

রঞ্জনের মতো ঠাণ্ডা মাথার মানুষের পক্ষেও আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরে রাখা সম্ভব আপাতত বোঝা যাচ্ছে না। শহরের বাইরে এই জায়গাতে ট্যাকের পয়সা খরচ করে আসার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র চিত্রশিল্পী বারেক কালিয়ানের বাড়ি দেখা নয়। আমাদের লক্ষ্য একটু গভির, আর সেটা হচ্ছে ওই বাড়িতে ঢুকে কিছু মূল্যবান ছবি চুরি করা। সাথে যদি উপরি কিছু টাকা-পয়সা পাওয়া যায়, তাহলে সোনায়-সোহাগা। তবে টাকা নিয়ে আমাদের অত মাথাব্যথা নেই, ছবি পেলে টাকাও আসবে। কথায় আছে, *'অতি লোভে, তাঁতি নষ্ট।'* আমরা বেশি লোভে বিশ্বাস করি না। সোজা কথায় বলতে গেলে আমরা সৎ এবং সাবধানি চোর। সরাসরি চোরও হয়তোবা বলা যায় না, রঞ্জন চোর শব্দটা একদম পছন্দ করে না, ও বলে : "নিজেদের চোর বলা মানে হচ্ছে যেচে যোগ্যতার অপমান করা। এর থেকে 'সংগ্রহ-শিল্পী' বলা ভাল।"

চুরির ব্যাপারটাকে রঞ্জন নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে একদম শিল্পের কাছাকাছি পর্যায়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু আমার অত রং চড়াতে ইচ্ছে করে না। চোর তো চোরই, তাতে সেটা যেভাবেই করা কিংবা বলা হোক না কেন! এই নিয়ে রঞ্জনের সাথে আমি তর্ক করতে যাই না। যার দলে যোগ দিয়ে দু'বেলা খাবার ব্যবস্থা হচ্ছে তার সাথে ঝামেলা করে নিজের পেটে নিজে লাথি মারার পক্ষপাতি নই। খুব বেশি রাগ হলে অন্যদিকে তাকিয়ে আঙুল ফুটাই, রঞ্জন তাতেই বুঝে যায় আলোচনার বিষয় পরিবর্তনের সময় হয়ে এসেছে। রঞ্জন অনেক সচেতন, অনেক তীক্ষ্ণ তার বুদ্ধি, সে সবাইকে ম্যানেজ করে চলতে পারে।

চিত্রশিল্পী বারেক কালিয়ানের বাড়ির উপর বেশ অনেক দিন ধরেই টার্গেট করে রেখেছিল রঞ্জন, তা প্রায় আট মাস তো হবেই। এরমধ্যেই চলেছে নানা রকমের প্রস্তুতি। আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ রোজ এসে এই বাড়ির উপর নজর রেখেছে পুরো সময়টা। বাড়িতে কে কে থাকে, কে কে আসে-যায়, সব আমরা পর্যবেক্ষণে রেখেছি। তারপর বাড়িতে কীভাবে ঢোকা যায়, কীভাবে বের হওয়া যাবে, এসব পরিকল্পনা রঞ্জন সাজিয়েছে। বাড়িতে আসা-যাওয়ার পথগুলো নিয়ে একটা ম্যাপও বানিয়েছে সে, রাহাত আর শুমেলকে সঙ্গে নিয়ে। শুমেল ভাল ছবি আঁকতে পারে, হাতেই চার কপি ম্যাপ তৈরি করে প্রত্যেককে এক কপি করে দিয়েছে। এরপরে রঞ্জন প্ল্যানটা টাইমলাইনে ফেলে সবকিছু নির্ধারণ করেছে। যেমন, ঠিক ক'টায় আমরা গাড়িতে উঠবো, কখন এখানে এসে পৌছবো, কখন বাড়ির ভেতরে ঢুকব, সেখান থেকে কখন বের হব, এসব একদম সময় ধরে ঠিক করা।

সেই সময় এতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। আমাদের যে সময় বের হবার কথা ছিল বেরিয়েছি, যখন এখানে এসে পৌছানোর কথা ছিল প্রায় তখনই এখানে চলে

BanglaBook.org

এসেছি, ড্রাইভার ভিন্ন হওয়াতেও তেমন কোনও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু, ঠিক দশ মিনিট আগেই একটা ব্যতিক্রম হয়ে গেছে রুটিনে। সেটা হলো এই বাড়িতে প্রবেশের ব্যাপারটা।

বাড়ির সুরক্ষা ব্যবস্থা তেমন কিছু জটিল নয় যে আমরা ভেতরে ঢুকতে পারব না। সদর দরজাতে কেবলমাত্র একজন দারোয়ান, তাকে ধোঁকা দেবার ব্যবস্থা ভেবে রাখা আছে। সমস্যাটা হচ্ছেন বারেক কালিয়ান নিজে! আমাদের কাছে খবর ছিল তিনি আজ সিঙ্গাপুরে একটা চিত্র প্রদর্শনিতে। সেখানে তার আঁকা তিনটে ছবি উঠবে। এই তথ্যের বিষয়ে কোনও সংশয় ছিল না। তবে বাড়িতে শিল্পী একা নন, তার স্ত্রীও আছেন। এছাড়া ঘরের কাজ করার জন্য দু'জন চাকর, বাগান দেখার জন্য মালি, আর একজন রাধুনিও থাকে এখানে। রাঁধুনি বিবাহিত, মাঝে মধ্যে সে দেশের বাড়িতে বেড়াতে যায়। অবশ্য মাসে দু'বারের বেশি না, আর গেলেও এক দিনের মধ্যে ফেরত চলে আসে। এই সময়ে রান্নার কাজ করে মালি। আগে অবশ্য সে-ই এ বাড়ির রাঁধুনি ছিল। এক সাথে দুটো কাজ সামলাতে সমস্যা হয় দেখে আরও একজন রাঁধুনির নিয়োগ হয়েছে মাস চারেক আগেই। এছাড়া একজন ড্রাইভারও আছে, তবে সে এখানে থাকে না, প্রয়োজনে আসে। বারেক কালিয়ানের দুই ছেলে, দুজনেই আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। দুনিয়াটাই এমন, টাকা-পয়সা ঠিকঠাক না থাকলে ভাল জায়গায় পড়ার যোগ্যতা থাকলেও পড়া হয়ে ওঠে না। আবার যাদের যোগ্যতা নেই তারাও দেখা যায় বাবার টাকার জোরে যেখানে যাওয়ার সম্ভাবনাই নেই সেখানে চলে যাচ্ছে। পৃথিবীটা সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদীদের হাতে চলে যাচ্ছে দিন দিন।

যাই হোক, ফিরে আসি সমস্যার কথায়। শিল্পী বারেক কালিয়ান তার স্ত্রীসহ এখনও বাইরে বের হচ্ছেন না। পরিকল্পনা অনুযায়ি আমরা বাড়িতে ঢুকব ওরা বেরিয়ে যাবার পরে। ওরা থাকা অবস্থায় ঢুকলে সমস্যা আছে। ঘটনা যদি বেশি গুরুতর দিকে মোড় নেয় তাহলে ওদের বেঁধে ফেলতে হতে পারে, তখন ওরা সিঙ্গাপুরের সেই প্রদর্শনিতে যেতে পারবে না। সেখানে না গেলে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ খবর নেবার চেষ্টা করবে। খবর না পেলে আবার থানা পুলিশ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং, অত ঝামেলাতে গিয়ে কাজ নেই, তার থেকে ওরা ঠাণ্ডা মাথায় কিছু না জেনেই যাবে সিঙ্গাপুরে, সেখানে গিয়ে তিন দিনব্যাপি উৎসব করবে। ফিরে এসে যখন জানতে পারবে ছবি চুরি হয়ে গেছে, ততক্ষণে আমরা পালিয়ে যেতে পারবো। আপাতত সেটাই পরিকল্পনা।

আরও পঁয়ত্রিশ মিনিট পেরিয়ে গেল, এখনও বারেক কালিয়ান বেরিয়ে যাচ্ছেন

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

না। ওদিকে মকবুল মিয়াকে লোভ দেখিয়ে ধার করা বাড়তি এক ঘণ্টা সময়ও প্রায় শেষের পথে। কিছুক্ষণ আগেই রঞ্জনের নির্দেশে শুমেল কাল্লুর মাথায় চাটি মেরে ওর ঘুম ভাঙিয়েছে। কাল্লু এখন থেকে থেকে হাই তুলছে। ওর নাক ডাকার তুলনায় দ্বিগুণ বিরক্তিকর লাগছে সেটা। রঞ্জন অধৈর্যভাবে বাম হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দাঁত দিয়ে ঘষছে আর বন্ধ দরজাটার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে।

এভাবেই আরও কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর আমাদের সকলকে একরাশ প্রশান্তি এনে দিয়ে বারেক কালিয়ানের বাড়ির সুদৃশ্য লৌহ-দরজাটা ঘড় ঘড় শব্দ করে খুলে গেল। সেখান থেকে শিল্পীর দামি মার্সিডিজ গাড়িটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আমাদের মাইক্রোটাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত ছুটে চলল হাইওয়ে ধরে। শিল্পীর যাত্রা পথের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। অবশেষে কাজ শুরু করার সময় এসেছে।

৩
সময় : দুপুর ০১:১৮

কাজটা শুরু করতে একটু দেরি হয়েছে বটে, তাতে বিশেষ সমস্যা নেই। ভেতরের কাজগুলো দ্রুত সামলে নিতে পারলে কোনও ঝামেলাই হবে না, সময় মতো এখান থেকে কেটে পড়া যাবে। এই কথাগুলোই রঞ্জন আমাদের বুঝিয়ে বলছিল আপাতত।

মকবুল মিয়াকে তার পাওনা টাকা দিয়ে আরও মিনিট দশেক আগেই বিদায় করা হয়েছে। বাক্সটাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গাড়ির সাথে, ওটা আব্দুলের বাসায় রেখে দেবে মকবুল মিয়া। বাক্সটার ভেতর পোশাক আর টুলস ছিল। সেগুলো এখন আমাদের পরনে। গাড়ির ভেতর বসে পোশাকগুলো বদলাতে হয়েছে। মকবুল মিয়া বিরক্তির চোখে তাকাচ্ছিল বারবার, উপেক্ষা করা হয়েছে তাকে। যাবার সময় লোকটার আনন্দ আর দেখে কে, পারলে রঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে! টাকাগুলো গোনার সময় মকবুল মিয়ার চোখ যেভাবে চক চক করছিল তাতে মনে হচ্ছিল যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। আমি অবশ্য ও বিদায় হওয়াতেই খুশি, ব্যাটার ঘ্যানঘ্যানানি আর সহ্য হচ্ছিল না। তার উপর কাল্লুর আবার মারামারির স্বভাব আছে, যখন তখন কেলেঙ্কারি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

যাই হোক, অতঃপর আমরা বড় পাঁচটা ঝোলা ব্যাগ প্রত্যেকের ডান কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। ব্যাগের মধ্যে আছে প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম।

একসাথে পাঁচজনই দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

জানতাম এই দরজা দিয়ে এমনি এমনি আমরা ভেতরে ঢুকতে পারবো না। যদি দারোয়ান বাঁধা দেয় তাহলে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। বাড়ির দেয়াল এত বড় যে মই ছাড়া সেটা টপকানো সম্ভব না। তাছাড়া দিনের বেলা রাস্তা-ঘাটে মই লাগিয়ে কারও বাড়ির মধ্যে ঢোকা যথেষ্ট সন্দেহজনক। বাড়িটা যতই শহরের বাইরে হোক না কেন, সেটা একটা আঞ্চলিক স্কুলের কাছাকাছি। আশেপাশে বেশ কিছু চায়ের দোকান রয়েছে। সেখানে দু-চারজন ক্রেতাও সবসময় থাকে। সুতরাং, মই লাগিয়ে ঢোকার পরিকল্পনা শুরুতেই বাতিল করে দিয়েছিল রঞ্জন। পরে ঠিক হলো আমরা ছদ্মবেশে বাড়িতে ঢুকবো। কী ছদ্মবেশ নেয়া যায় সেটা নিয়ে অবশ্য বেশ কয়েকটা নির্ঘুম রাত আলোচনায় পার হয়েছে। অবশেষে আমার দেওয়া একটা বুদ্ধিই সবার মনে ধরল। সেটা হলো টেলিফোন লাইন সারানোর ছুতোয় বাড়িতে ঢোকা। সেজন্য ছদ্মবেশ হতে হবে টেলিফোনের লাইনম্যানদের মতো। বুদ্ধিটা

BanglaBook.org

মাথাতে এমনি এমনি আসেনি, এটা দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ আর গবেষণার ফসল। আসলে এই এলাকার টেলিফোন লাইনের কন্ট্রোল-বক্স বারেক কালিয়ানের বাড়ির গণ্ডির মধ্যে। শিল্পী যখন বাড়ি তৈরি করেছিলেন তখন দেয়ালের ভাস্কর্য আর আঙ্গিক যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য এটাকে বাড়ির ভেতরেই রাখতে হয়েছিল। যদিও তাতে সরকার আপত্তি করতে পারতো, কিন্তু বারেক কালিয়ান বিশাল প্রতিপত্তিশালি লোক, অনেক উচ্চপদস্থদের সাথে তার জানা শোনা, বিরাট তার পরিধি। সুতরাং নিয়মগত জটিলতা তিনি খুব দ্রুতই কাটিয়ে নিয়েছিলেন। সঠিক জায়গাতে লিংক থাকলে দেশে আজকাল সব কিছুই সম্ভব, এ ঘটনা তার অন্যতম বড় উদাহরণ।

বাড়ির চারপাশটা যখন পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিলাম তখনই কয়েকবার টেলিফোনের লাইনম্যানদের এখানে ঢুকতে দেখেছি। তাই বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল। সেই বুদ্ধিমতোই ছদ্মবেশ নিয়েছি। বর্তমানে আমাদের জামা আর গেঞ্জির রং হয়তো ভিন্ন কিন্তু পরার ধরন এক রকম, সামনের দুটো বোতাম খোলা, ভেতরে একটা করে আধা নোংরা স্যান্ডো গেঞ্জি। একটা করে পকেটবহুল গ্যবারডিনের প্যান্ট। প্যান্টের পকেটে আছে বিভিন্ন টুলস, স্ক্রুড্রাইভার, প্লায়ার্স, আর অতিরিক্ত হিসেবে আমার আর কাল্লুর কাঁধে ঝোলান দুটো গোল করে পেঁচান টেলিফোনের তারের বান্ডিল।

বাড়ি থেকে সাধারণ পোশাকে বেড়িয়েছি প্রতিবেশিদের সন্দেহ এড়াতে। এরপর গাড়িতে পোশাক বদলেছি, কারণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পোশাক পরিবর্তন দৃষ্টিকটু, আশেপাশের মানুষগুলোর সন্দেহ হতে পারতো তাতে। তবে মূল সমস্যা হয়েছিল মকবুল মিয়াকে নিয়ে, সে বার বার আয়নাতে পেছনের দিকে অবাক হয়ে দেখছিল। পরে রঞ্জন ওকে বলেছে আমরা একটা সিনেমার শুটিংয়ে যাচ্ছি, তাই এই সাজপোশাক। আব্দুল হলে মিথ্যা বলতে হতো না, সে জানে আমরা কী করি, কিন্তু মকবুল নতুন, তাকে ভরসা নেই। সুতরাং রঞ্জনকে মিথ্যা বলতে হয়েছে। তাতে কী? দুই একটা মিথ্যা বেশি বললে চোরেদের জাত যায় না, বরং সেটা আরও পাকা-পোক্ত হয়।

আমরা এখন দরজার একদম কাছে দাঁড়িয়ে আছি। কাল্লু দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়েছে এইমাত্র, দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্বটা তাকেই দিয়েছে রঞ্জন। দারোয়ান ওপাশ থেকে বলে উঠল, "কে? কে বাইরে খট্ খট্ করে?"

কাল্লু আস্তে করে বলল, "আমরা, দরজাটা খুলো।"

দারোয়ান দরজা না খুলে দরজার উপরে লাগানো ছোট্ট একটা খোপের মতো জানালা খুলে বাইরে চোখ রাখল। বাজখাই গলায় বলল, "কী চাই?!"

কাল্লু গদ গদ ভাব করে হাসল। "আমরা টেলিফোনের লোক, লাইনে কাম

BanglaBook.org

করতে আসছি," জানাল দারোয়ানকে।

লোকটা কিছুই বুঝতে পারেনি এমন একটা ভাব করে বলল, "এখানে কেন, রাস্তায় বসে কাজ করলেই পারো!"

মেজাজ গরম হলো, সুযোগ পেয়ে ব্যাটা যা ইচ্ছে তাই বলছে, ভালো করেই জানে বাক্স ভেতরে, কাজ করার জন্য ঢুকতে দিতেই হবে। তা-ও শুধু শুধু ঝামেলা করার চেষ্টা। আমি মেজাজ নিয়ন্ত্রনে নিয়ে ফেললও কাল্লু বোধহয় পুরোপুরি নিতে পারল না, ও কর্কশভাবে বলল, "আরে মিয়া! দরজা খুলতে কইলাম না, হুদাই পেঁচাও ক্যান!"

এই কথা শুনে দারোয়ান ক্ষেপে গেল। রেগে মেগে বলল, "দরজা খোলা যাবে না।" দরজার উপরের ছোট্ট খোপটা খুট করে বন্ধ করে চুপ চাপ হয়ে গেল সে।

তাৎক্ষনিক কাল্লুর মাথায় চাটি মারলাম। শুমেল আর রাহাত কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। রঞ্জন কাল্লুকে পেছনে ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল। দরজাতে ভদ্রভাবে টোকা দিলো।

ভেতর থেকে দারোয়ানের আওয়াজ ভেসে এল, "বললাম না! দরজা খোলা যাবে না।"

রঞ্জন বিনয়ের সাথে বলল, "আরে ভাই, রাগ করো কেন! ওর কথায় কিছু মনে করো না। সারাদিন টেলিফোন পোষ্ট বেয়ে উঠতে উঠতে ওর স্বভাবটাও একদম হনুমানের মতো হয়ে গেছে। বুঝতেই তো পারো কাজে এসেছি, লাইন বক্সটা তোমাদের দেয়ালের ভেতর। তাছাড়া এ-বাড়ি থেকেও টেলিফোন অফিসে অভিযোগ জমা পড়েছে। লাইনে সমস্যা করছে নাকি, সেটাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

একটু পরেই আবার দরজার সেই ছোট্ট খোপ খুট করে শব্দ তুলে খুলে গেল, সেখান থেকে দারোয়ানের পরিচিত মুখ দৃশ্যমান হলো। সে সরলভাবে বলল, "কিন্তু সাহেব তো বাড়িতে নেই।"

রঞ্জন অবাক হবার ভঙ্গি করল। "বাড়িতে নেই! কেন, কোথায় গিয়েছেন তিনি?"

দারোয়ান স্তরের কারও সাথে ভদ্রভাবে কথা বললে সে কিছুটা চমকে যায়, এই দারোয়ানে ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হলো না। সে-ও ভদ্রভাবে বলল, "সেটা তো জানি না! কিন্তু দুই-তিন দিনের মধ্যে ফিরবেন বলে মনে হয় না।"

রঞ্জন বলল, "আচ্ছা বুঝলাম, কিন্তু বাসার টেলিফোন তো সঙ্গে করে নিয়ে যাননি। তাছাড়া, উনি যদি এসে দেখেন টেলিফোন ঠিক হয়নি, তাহলে আবার উপরমহলে ফোন করবেন। তখন আবার আমরা সমস্যায় পড়ে যাব। বুঝতেই তো

BanglaBook.org

পারো ভাই। আমরা চেষ্টা করব দ্রুত কাজ সেরে চলে যাওয়ার। তুমি আর দেরি না করে আমাদের ভেতরে ঢুকতে দাও।"

দারোয়ান আমতা আমতা করলো, "কিন্তু টেলিফোনের লাইনের কাজে তো কখনও দুজনের বেশি আসে না! আজ পাঁচজন কেন?!"

এবার শুমেল জবাব দিলো, "আসলে এলাকার অনেকগুলো লাইনে সমস্যা, তার উপর আবার তোমাদের বাসাতেও সমস্যা, বেশি লোক এলে কাজ দ্রুত হবে তাই অফিস থেকেই একসঙ্গে পাঁচজনকে পাঠিয়ে দিলো।"

রাহাতও তাড়া দিলো, "আহা, আর কত প্রশ্ন করবে, এমন একটা ভাব করছ যেন কাজ না ডাকাতি করতে এসেছি!"

রাহাতের কথায় কাজ হলো, দেখলাম অবশেষে দারোয়ান আবার দরজা থেকে সরে গেল আর তার কিছুক্ষণ পরেই দরজাটা আস্তে আস্তে স্লাইড করে খুলে যেতে থাকল। দরজা খুলে যেতেই আমরা গুঁটি গুঁটি পায়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তারপর দরজা আবার বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম।

এই বাড়িতে টেলিফোনের যে সমস্যাটার কথা একটু আগে রঞ্জন বলছিল সেটা পুরোপুরি ধাপ্পা নয়। আমরা কয়েকদিন ধরেই বাইরে থেকে টেলিফোনের তার কেটে আর জুড়ে, সময় সময় এই সমস্যার সৃষ্টি করছিলাম। প্ল্যানের এই অংশটুকুও কাজে লাগাতে দারুন প্রশান্তি অনুভব করলাম। এটা আমাদের পঞ্চম চুরি, এর আগে যে চারটা চুরি করেছি সেগুলো হয়তো এত বড় ছিল না, কিন্তু এরকম টুকরো টুকরো পরিকল্পনার কারণে সবগুলোই যথেষ্ট সফল ছিল।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই রঞ্জন, রাহাত আর কাল্লুকে উদ্দেশ্য করে বলল, "তোরা ওই টেলিফোন লাইন বক্সের ব্যাপারটা একটু চেক করে দেখ, আমরা ভেতরের ব্যাপারটা দেখছি।" তারপর দারোয়ানের দিকে ফিরল সে, "চল ভাই!" বলল তাকে।

দারোয়ান অবাক হয়ে রঞ্জনের দিকে তাকাল, "চল মানে!? কোথায় যাব?"

"কেন আমাদের বাসার ভেতরে নিয়ে চল," নিশ্চিতভাবে উত্তর দিলো রঞ্জন।

এবার বিরক্তির হলো দারোয়ান, "কেন, তোমাদের চাবি নেই? ওই তো দেখা যাচ্ছে দরজা, ওখানে গিয়ে বেল দিলেই ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলে দেবে। এর জন্য আমার আবার সাথে যাওয়ার কী দরকার?!"

রঞ্জন বেগতিক দেখল, আসলে তার প্ল্যান অনুযায়ি দারোয়ানকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া জরুরি। তাকে তো আর বেঁধে বাইরে ফেলে রাখা যায় না, হঠাৎ কেউ দেখে ফেললে মুশকিল। তা সেই দর্শক বাইরে রাস্তা থেকেই দেখুক কিংবা ঘরের ভেতরের

BanglaBook.org

থেকেই দেখুক। আজকাল আবার মোবাইলের যুগ, সুতরাং খবর পুলিশ পর্যন্ত যেতে দেরি হবে না। চুরিতে ঝুঁকি অত্যাধুনিক যুগে অনেক বেড়েছে।

অগত্যা, আমিই দারোয়ানকে বোঝানর চেষ্টা করলাম, "আরে, তুমিও বোকা, আমাদের দেখে যদি অপরিচিত লোক ভেবে তোমার মতই ঢুকতে না দেয়, তখন! কিছুটা সময় অযথা নষ্ট হবে, তাই না? তার থেকে তুমিই চল, আমাদের বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে ফিরে আসবে। কতই বা সময় লাগবে তাতে!"

আমরা নাছোড়বান্দার মতো চেপে ধরাতে দারোয়ান আর বেশিক্ষণ না বলে থাকতে পারল না। অবশেষে আমাদের সাথে সে একটু একটু করে দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

BanglaBook.org

৪

সময়: দুপুর- ০১:৫৫

এই অল্প সময়ের মধ্যেই কিছু ছোট্ট ঘটনা ঘটে গেছে, তার ফলস্বরূপ আমরা এখন শিল্পী বারেক কালিয়ানের ড্রইং রুমে বসে আছি।

প্রথমে দারোয়ান আমাদের নিয়ে এসে ঘরের বেল টিপল। তার সাথে তিন জন বাড়তি মানুষ দেখে কাজের লোক পরিচয় জানতে চাইল। তখন দারোয়ান সবকিছু বলল। এরপর ঘটাং করে খুলে গেল বাড়ির দরজাটা। আমাদের ধারণা ছিল দরজা কাজের লোক নিজের হাতে খুলবে, কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম তেমনটা হয়নি, কোন একটা জায়গা থেকে রিমোটলি বোতাম টিপে এই কাজ করা হয়েছে। ব্যাপারটা আমাদের জন্য বড় একটা ধাক্কা ছিল। কারণ পরিকল্পনা মোতাবেক দরজা খোলার সাথে সাথেই সেই চাকর আর দারোয়ানকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলার কথা। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়ে উঠল না। যদিও আগে যতবার এই বাড়ির দরজা খুলতে দেখেছি গত আট মাসে, ততবার কোনও না কোনও চাকরই এসে দরজা খুলেছিল। আজ হঠাৎ করে এমন একটা ব্যতিক্রম ঘটবে এটা ধারণা করা কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না।

প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতেই দেখলাম দারোয়ান চলে যেতে চাচ্ছে। তাকে আটকানোর তেমন কোনও উপায় না পেয়ে ছেড়ে দিতে হলো। অবশ্য এই সুযোগে কাল্লু আর রাহাত মিলে একটা জরুরি কাজ সমাধা করে ফেলল। ওরা টেলিফোন বক্স থেকে বাড়ির লাইনটা পুরোপুরি অকেজো করে দিল। কাল্লু আগে টেলিফোন অফিসে কাজ করতো। প্রায় সাত মাসের মতো করেছিল লাইনম্যানের কাজ, তাই এসব কীভাবে করতে হয় সেটা ভাল করেই জানে।

দারোয়ানকে ফিরে আসতে দেখে রাহাত আর কাল্লু বুঝে গেছিল কিছু গড়বড় হয়েছে, তাই মনোযোগ দিয়ে ওই বক্সের সামনে দাঁড়িয়েই খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা করার ভাব দেখাল ওরা। অন্যদিকে বাকিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো বসে পড়লাম ড্রইং রুমের সোফায়।

এই ঘটনার পর আরও দশ মিনিট নির্বিঘ্নে পেরিয়েছে, এখনও একইভাবে বসে আছি। মিশনে আসার আগে নিজেদের ভেতর যোগাযোগ রাখার জন্য একটা ব্যবস্থা ঠিক করা হয়েছিল, সেটাই কাজে লাগিয়ে রাহাত আর কাল্লুর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছিল । আমরা প্রত্যেকে একটা করে সাধারণ মোবাইল আর হেডফোন ব্যবহার করছি। সিম কার্ডের নম্বরগুলোও বেনামে একই কোম্পানি থেকে নেয়া আর সেগুলো নিজেদের মধ্যে এফএনএফ করা আছে যাতে একদম নামে মাত্র পয়সায় কথা বলা

BanglaBook.org

যায়। যে খরচটা এর জন্য হচ্ছে সেটাও মিশনের বাজেটে ধরা আছে। স্বচ্ছ আর বস্তুবাচক বাজেট, সেখানে উল্টো-পাল্টা খরচের কোনও জায়গা নেই। বাজেট তৈরি করেছে রঞ্জন নিজে, তার কথা হচ্ছে, "বাজেট ফেল, তো *মিশন গোজ টু হেল*!"

কাল্লু আর রাহাতকে বাইরে থাকার আদেশ দিয়ে আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। হঠাৎ লাউড-স্পিকারে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আপনাদের এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত। আমি এই বাড়ির কেয়ারটেকার ফিরোজ। আপনারা টেলিফোন ঠিক করতে এসেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। বাড়িতে তিনটা ল্যান্ডফোন আছে। এর একটা দোতলায়, আর দুটো তিনতলায়। এই ড্রইং রুমের একবারে শেষ মাথাতে গেলে একটা ছোট্ট দরজা পাবেন, দরজা দিয়ে ঢুকলে পাবেন উপরে ওঠার সিঁড়ি। সেটা দিয়ে উঠলে দীর্ঘ করিডোর নজরে পড়বে। সেখানে আপনাদের স্বাগত জানানোর জন্য বাড়ির অপর কেয়ারটেকার রিহা রয়েছে, সে-ই যেখানে যাবার দরকার নিয়ে যাবে। ধন্যবাদ।"

ফিরোজের কথা শেষ হতেই আমরা তিনজন একে অপরের দিকে তাকালাম। ঘটনা আমার মতো যে রঞ্জন আর শুমেলের কাছেও ভাল ঠেকছে না সেটা ওদের চাহনি দেখেই বুঝলাম। ফিরোজের কথা শুনে যা বোঝা গেল তাতে সে জানে আমরা ড্রইং রুমে বসে আছি। কিন্তু কীভাবে জানল? সেটা জানতে হলে তো ঘরে কোনও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা থাকা দরকার। আমার অনুসন্ধানি চোখ সহসাই ক্যামেরা খোঁজা শুরু করে দিলো। দুটো ক্যামেরা আবিষ্কার করলাম সাথে সাথেই। বড় ড্রইং রুমটাকে দুটো ভিন্ন দিক থেকে তাক করে আছে। দেখলাম, রঞ্জন ওদুটো ক্যামেরা খেয়াল তো করেছেই, বরং আরও বেশি আবিষ্কার করেছে। রঞ্জন চোখের ইশারায় আরও দুটো ক্যামেরার অবস্থান জানিয়ে দিলো।

খাঁচায় বন্দি বাঘ যেমন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের দেখে অসহায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমরাও তেমন দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। সমস্ত প্লানটা ভেস্তে না গেলেই হয়। অবশ্যই হিসেবে কিছু সমস্যা হয়েছে, কিন্তু তার জন্য চুরি থেকে পিছিয়ে আসার কোনও গুরুতর কারণ এখনও হয়নি। আগের চুরিগুলোতেও এরকম কিছু ঝামেলা হয়েছে যার জন্য পরিকল্পনাতে তাৎক্ষনিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে হয়েছিল। সেগুলো আজকের মতো বাজে পরিস্থিতি যদিও ছিল না, তবে এসব দেখে ভয়ে পিছিয়ে আসা এখন আর সম্ভব না।

আমরা ভেজা বেড়ালের মতো কেয়ারটেকার ফিরোজের নির্দেশনা মেনে ছোট দরজাটার কাছে চলে গেলাম। এরপর শুমেল হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলতেই একটা ঘোরানো সিঁড়ি দেখতে পেলাম, উপরের দিকে উঠে গেছে সোজা। সিঁড়ি ধরে চললাম। প্রথমে রঞ্জন, তার পেছনে শুমেল, আর সবার শেষে আমি। খেয়াল করলাম রঞ্জন উপরে উঠতে উঠতেই আশেপাশে ভাল করে লক্ষ্য করে কী যেন একটা

BanglaBook.org

দেখছে। ওকে বিরক্ত করলাম না। এভাবে কিছুক্ষণ পর একটা দরজার সামনে পৌঁছলাম। রঞ্জন হাতল ধরে আলতো করে মোচড় দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

দরজার অপর পাশে অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিল এক মেয়ে। এই মেয়েকে এর আগেও বাড়ির বাইরে থেকে দেখেছি, কিন্তু কাছে থেকে দেখতে একদম অন্য রকম লাগছিল। আরও অনেক বেশি লাবণ্যময়ি মনে হলো ওকে। বাড়ির কাজের মেয়ে এত লাবণ্যময়ি হবে ভাবিনি। হয়তো মালকিন আর মালিক নেই দেখে ইচ্ছে মতো মেকআপ করে ভোল পাল্টে ফেলেছে। বড়লোকদের খেয়াল খুশি আলাদা, সুন্দরি কেয়ারটেকার রাখার অন্য কোনও উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। দেখলাম শুমেল একটু অস্বস্তি বোধ করছে। হয়তো, ওর বাবার পুরনো অভ্যাসটার কথা মনে পড়ে গেছে সহসাই।

মেয়েটা আমাদের তিনজনকে হেসে স্বাগত জানাল। "আমি রিহা। আপনারা টেলিফোন ঠিক করতে এসেছেন, তাই না? আসুন আমার সাথে," মার্জিত ভাষায় বলল।

রিহাকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে শুমেল প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা, ফিরোজ সাহেব না এসে আপনাকে পাঠালেন কেন?"

রিহা হাসিটা ধরে রেখে জবাব দিলো, "উনি ব্যস্ত আছেন। একটু পরে এসে আপনাদের সাথে দেখা করবেন।"

রিহা ঘোরানো পথ ধরে হেঁটে চলল। পথের দুপাশে হরেক রকম রঙিন বাতি। তার মধ্যে আবার নানান নক্সা করা। বারেক কালিয়ান যে শুধু বাড়ির বাইরেটা নয় ভেতরটাও খুব যত্ন নিয়ে সাজিয়েছেন সেটা ভালই বোঝা গেল। সুদৃশ্য বাতিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আবার অদ্ভুত সব আর্টওয়ার্ক, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখতে হয়। সব চিত্রকর্ম শিল্পীর নিজের নাকি অন্য কেউ করেছে সেটা সঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু গৃহসজ্জায় তার নির্দেশনা অবশ্যই ব্যাপকভাবে রয়েছে। আসলে এটাকে বাড়ি না বলে একটা আর্ট গ্যালারি বললেও বোধহয় তেমন কিছু ভুল বলা হবে না।

মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে খেয়ালই করিনি কখন রিহা একটা কারুকাজ করা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমি বেখেয়ালে ওর সাথে ধাক্কা খেলাম, মেয়েটা মেঝেতে পড়ে গেল। অনুতপ্ত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। "সরি, আপনার লাগেনি তো!" বললাম ওকে।

রিহা হাতটা ধরে ধীরে ধীরে উঠল। কোমরে যে জায়গাতে আঘাত লেগেছিল সেখানে হাত বুলাতে বুলতে বলল, "না, তেমন একটা লাগেনি।"

অনুতাপের রেশ ধরে বললাম, "আসলে খেয়াল করিনি, এত সুন্দর সব ছবি দিয়ে সাজানো জায়গাটা, মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম।"

রিহা অমায়িক ভঙ্গিতে হাসল। "ইটস ওকে।"

BanglaBook.org

চাবির গোছা থেকে একটা চাবি দরজার কি-হোলে ঢুকিয়ে বাঁ-দিকে মোচড় দিলো রিহা। খট্ করে সুন্দর কারুকাজ করা দরজাটা খুলে গেল। ওকে অনুসরণ করে ঘরের ভেতর একে একে ঢুকে পড়লাম।

যথারীতি এই ঘরটাও খুব সুন্দর করে সাজানো। উপর থেকে ঝুলছিল সুদৃশ্য ঝাড়বাতি। আশেপাশে রাখা জিনিসগুলোর মধ্যে বারেক কালিয়ানের নিজের হাতে আঁকা কিছু পেইন্টিং, একটা সেগুন কাঠের বিশাল বড় পালঙ্ক, পালঙ্কের উল্টো দিকে দুটো কাঠের আলমারি যেগুলোর দরজায় খোদাই করা চিত্রকর্ম, একটা বড় লোহার সিন্দুক, আর একটা দামি দেখতে বেডসাইড ছোট ফ্রিজ নজর কাড়ল।

আমাদের হা-করে তাকিয়ে থাকতে দেখে রিহা বলল, "এটা স্যারের বেডরুম। আপনাদের কাজের জিনিসটা ওই কোনায়, জানালার পাশে রাখা আছে।"

ডানহাতের তর্জনি দিয়ে জানালার ধার ঘেসে একটা টেবিল দেখাল রিহা। তারপর বলল, "আপনার কাজ করুন, আমি যাই, কিছু চা-নাস্তার ব্যবস্থা করি।"

বেগতিক দেখলাম, রিহা যদি এখান থেকে চলে যায় তাহলে ওকে বেঁধে ফেলার পরিকল্পনাটা মাটি হয়ে যাবে। তাড়াহুড়া করে বললাম, "রিহা! দাঁড়ান।"

ডাক শুনে রিহা থমকে দাঁড়াল, জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। শুমেলও লক্ষ্য করলাম কিছুটা ভড়কে গিয়ে এদিক ওদিক দেখছে। তবে রঞ্জন বোধহয় বুঝতে পারল আমার পরিকল্পনাটা, ও উপর থেকে নিচে সামান্য মাথা ঝাঁকাল।

অপ্রস্তুত হেসে রিহাকে বললাম, "একটা ফোন সারাতে তো তিনজন লাগে না! আপনি বরং আমাকে অন্য ফোনের কাছে নিয়ে চলুন, দেখি ওটা ঠিক করা যায় কি না। এক সাথে দুটোতে কাজ করলে কাজ দ্রুত হবে, কি বলেন?"

রিহা বুঝল আমি আসলে কী বলতে চাচ্ছি। ও সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল। "ঠিক বলেছেন, তবে চা-নাস্তা খাবার আগে কিছু না। আমি যাই চা নিয়ে আসি, তারপরে আপনাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাব, কেমন?"

বেশি তাড়াহুড়া করলে প্ল্যান ভেস্তে যেতে পারে। সুতরাং, সামান্য ইতস্তত করে বললাম, "ঠিক আছে, আপনি চা নিয়ে আসুন, সেটা খেয়েই কাজে হাত দেওয়া যাবে। ততক্ষণে আমরা এঘরের টেলিফোনটা দেখি পরীক্ষা করে।"

আমাদের ঘরের ভেতরে কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় রেখেই রিহা দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

৫

সময় : দুপুর ০২:২৩

এইমাত্র কেয়ারটেকার রিহা দরজা চেপে দিয়ে চা আনতে গেছে। যদিও চা খাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে কিংবা আকাঙ্ক্ষা আমাদের কারোই নেই। এখনও পর্যন্ত কোনও কিছুই পরিকল্পনামতো হয়নি। পরিকল্পনা সঠিকভাবে এগুলে এতক্ষণে বাড়ির দুই চাকর, যারা এখন নিজদের উন্নত ভাষায় কেয়ারটেকার বলছে, তারা একটা ছোট্ট ঘরে বন্দি থাকার কথা ছিল। রাধুঁনিও রান্নাঘরে বন্দি হয়ে থাকার কথা ছিল। এতক্ষণে মালিকেও ধরতে যাবার কথা ছিল। অথচ, একগাঁদা সময় নষ্ট হয়েছে কেবল।

রিহা চলে যেতে প্রথমেই আমি আর রঞ্জন পুরো ঘরটা সাবধানে পরীক্ষা করে দেখলাম। আমরা যখন দেখছিলাম তখন শুমেল টেলিফোন নিয়ে গুঁতাগুঁতি করছিল, যাতে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা দিয়ে কেউ দেখলে ভাবে আমাদের মধ্যে একজন টেলিফোন সারাচ্ছে আর বাকি দুজন মুগ্ধ হয়ে ঘরের সাজসজ্জা দেখছে শুধুমাত্র।

যখন নিশ্চিত হলাম ঘরে কোনও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা নেই তখন রঞ্জন মোবাইলে কাল্লু আর রাহাতের সাথে যোগাযোগ করল। মোবাইলগুলো এখন কনফারেন্স মুডে আছে। কার সাথে কী কথা হচ্ছিল সব শুনতে পাচ্ছিলাম প্রত্যেকে। রঞ্জনের নির্দেশে রাহাত কাজ শুরু করলো, একাগ্রভাবে মোবাইলের ছোট্ট হেডফোনগুলোতে কান রাখলাম।

রাহাত এগিয়ে গেল দারোয়ানের কাছে, দ্বিধা ভরা কণ্ঠে বলল, "ভাই, একটা সমস্যা হয়েছে।"

দারোয়ান বিরক্ত হলো। "কী সমস্যা?" প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানতে চাইল।

"সমস্যা মানে, তেমন কিছু না। তবে বেশি দেরি হলে সেটা লজ্জার ব্যাপার হয়ে যেতে পারে!" আমতা আমতা করল রাহাত।

দারোয়ান তাড়া দিলো, "আরে ভাই, এত পেঁচান কেন? ঠিক করে বলেন, কী সমস্যা।"

রাহাত খুব লজ্জা পাচ্ছে এমন ভাব নিয়ে বলল, "না ইয়ে, মানে আমার একটু টয়লেটে যাওয়া লাগতো আরকি! সকাল থেকেই পেটে সামান্য গণ্ডগোল। আর বেশিক্ষণ ধরে রাখলে ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি।"

দারোয়ান হো হো করে হেসে ফেলল। "ধুর! এই সামান্য কারণে এত লজ্জা করছেন কেন? আসেন, আপনাকে টয়লেটে নিয়ে যাই।"

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর একটা দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝলাম, দারোয়ান তার ব্যবহারের জন্য বাড়ির বাইরে যে টয়লেটটা আছে সেখানে রাহাতকে নিয়ে গেছে। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করে চললাম।

দরজা খুলে যেতেই রাহাত জিজ্ঞেস করলো, "ভাই, সাবান আছে তো?"

দারোয়ান আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিল, "আছে আছে, সব আছে। সাবান আছে, পানি আছে, গিজারও লাগানো আছে, চাইলে গরম পানিও ব্যবহার করতে পারেন। স্যারের অসীম দয়া, শীতের দিনে যাতে কষ্ট না হয়ে তাই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

দারোয়ানের আত্মবিশ্বাসি জবাবের পরেও রাহাত ফের প্রশ্ন করলো, "ভাই, সাবান তো দেখতে পাচ্ছি না।"

এবারে দারোয়ান অস্থিরভাবে বলল, "আহা, দেখেতে পাচ্ছেন না! ওই তো! ওই দেখেন কমোডের পাশে। ওই যে, দেয়ালের সাথে লাগানো কেসের..."

সহসাই একটা আর্ত চিৎকার শুনতে পেলাম, "আ..."

একটু পর ওপাশ থেকে রাহাতের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "বস! কাজ হয়ে গেছে। দারোয়ানটার মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছি। এবার কী করব?"

রঞ্জন ঠাণ্ডা মাথায় বলল, "প্রথমেই ওর জামা-কাপড় তুই পরে নে। তারপর ব্যাটাকে শক্ত করে হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে, কমোডের সাথে বেঁধে ফেল।"

কিছুক্ষণ পর এসে জানালো, "বস, ব্যাটাকে বেঁধে ফেলেছি শক্ত করে।"

রঞ্জনের মুখে হাসি ফুটল। "এবারে আমাদের পূর্বের পরিকল্পনামত তুই ওর জায়গায় বসে পাহারাদারের কাজ কর। কেউ আসলে বলবি, স্যার নেই। ভাগিয়ে দিবি দরজা থেকেই, বুঝলি?"

এবারে রাহাত দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "ওকে বস।"

প্রায় সাথে সাথেই একটা দরজা বন্ধের শব্দ শুনলাম। আরও কিছুক্ষণ পর শুনলাম দারোয়ানের জন্য পেতে রাখা টুলে রাহাতের বসে পড়ার শব্দ। অবশেষে রঞ্জন বিজয়ীর হাসি দিল। এতক্ষণে কিছু একটা পরিকল্পনামতো হয়েছে। এখন বাইরে থেকে কেউ সহসা ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে না।

শুমেল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "শয়তানটা অনেক ঝামেলা করছিল, একশটা প্রশ্ন। ওকে তো আমারও মারতে ইচ্ছে করছিল। রাহাতটা একা একাই পুরো মজাটা নিল, ধুর!"

সুযোগ বুঝে টিপ্পনি কাটলাম, "আচ্ছা বাবা, মন খারাপ করিস না, মিস রিহাকে বাড়ি মারার সুযোগটা তোকেই দেওয়া হবে।"

শুনে শুমেলের মুখটা পাংশু হয়ে গেল। একটা দুঃখ দুঃখ ভাব নিয়ে ও বলল,

BanglaBook.org

"না, সুন্দরি মেয়েদের সাথে মারামারি করতে চাই না। ওই কাজটা তুই করিস।"

আমি বললাম, "ইশ! তোর ভাল লাগে না, আর আমার বুঝি খুব মজা লাগে সুন্দরি মেয়েদের সাথে মারপিট করতে! ব্যাটা ফাজিল কোথাকার।"

রঞ্জন আকাশে একটা হাত তুলে দিলো। "আহ্!! থামবি তোরা! রিহাকে কে মাথায় বাড়ি মারবে সেটা যদি ঠিক না করতে পারিস তাহলে আমি গিয়ে বাড়ি মারব, হয়েছে এবার? এখানে দেয়ালেরও কান আছে বুঝলি? কথা-বার্তা সাবধানে বলবি, নইলে ঝামেলায় পড়ে যাবো।"

দুজনে ভেজা বেড়ালের মতো চুপসে গেলাম। কিছুক্ষণ পর মিন মিন করে বললাম, "ধুর বস, তোমাকে করা লাগবে না, আমিই পারব করতে। শুমেলের সাথে একটু মজা করছিলাম।"

রঞ্জন গম্ভিরভাবে বলল, "হুম।"

শুমেল পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে চাইল। "এই ঘর থেকে কী কী জিনিস সরানো যায় সেটা ঠিক করে ফেলা উচিত। হাতে খুব বেশি সময় নেই। মেয়েটা যে কোনও সময়ে চলে আসতে পারে।"

শুমেলের কথায় আমেজ ফিরে পেলাম, এতক্ষণে একটা কাজের কথা বলেছে ও। সুতরাং যেই কথা সেই কাজ, আমরা একটু একটু করে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম। ঘরে সব মিলিয়ে ৩টা ছবি পাওয়া গেল বারেক কালিয়ানের আঁকা, এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পীর আরও ২টা ছবি আছে। অন্য শিল্পী দু'জন পরিচিত নয়, তবে ছবি সরিয়ে ফেলতে পারলে খুঁজে দেখা যাবে তাদের নাম। শিল্পীর শোবার ঘরের দেয়ালে যখন ছবি দুটোর স্থান হয়েছে, তখন সে দুটোকে তো আর মামুলি বলে ফেলে দেওয়া যায় না!

এছাড়াও ঘরের তল্লাশি নিয়ে আরও কয়েকটা দামি শো-পিস আর একটা পুরনো আমলের বড় দেয়াল ঘড়ি পাওয়া গেল। শো-পিস চুরি করার মতো ছিঁচকে চোর আমরা না, তাই ওগুলো এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু ঘড়িটা আসলেই নজর কাড়ল, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটার অ্যান্টিক মূল্য অনেক। তবে, অত বড় ঘড়িটা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া আসলেই কষ্টসাধ্য। সুতরাং, আপাতত ওটার থেকেও নজর কিছুটা সরিয়ে রাখলাম।

একটা জিনিস বিশেষভাবে নজর কাড়ল, সেটা হচ্ছে বারেক কালিয়ানের ঘরে রাখা সিন্দুক। বড় লোহার একটা সিন্দুক, আমরা তিনজনেই সেটার সামনে অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে দাঁড়ালাম। সিন্দুকটা দেখে বোঝাই যাচ্ছিল সেটা বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করে ভাঙা সম্ভব না, অন্য কোনও উপায় দেখতে হবে।

BanglaBook.org

রঞ্জন বলল, "হিরন, দেখ তো, খুলতে পারিস কি না।"

নির্দেশ পেয়ে ভাল মতো সিন্দুকটা পরীক্ষা করলাম। একদম নিরেট লোহার সিন্দুক, কোনও খাদ নেই। জিনিসটা কোনভাবেই টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। কমপক্ষে ৮-১০ জন থাকলে হয়তো চেষ্টা করে দেখা যেত। সিন্দুকের উপরে একটা ডিজিটাল কি-প্যাড ছোট্ট ফ্রেমের মধ্যে লাগানো, দেখে মনে হয় কোনও পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত। রঞ্জন সিন্দুকের ব্যাপারটা আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে বলেছে তার পেছনে অবশ্য একটা কারণ আছে। আমি ম্যানুয়াল লক খুলতে ওস্তাদ। মূলত এই গুনটির জন্যই দলে আমার স্থান হয়েছে।

সিন্দুকের ডিজিটাল কি-প্যাডের পাশাপাশি একাটা ম্যানুয়াল লকও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। আমি ম্যানুয়াল কম্বিনেশন লকের দুই ইঞ্চি উপরে কান লাগালাম। লকটা ধীরে ধীরে ডানে ঘোরানো শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরেই খট করে শব্দ হলো। আবার উল্টো ঘোরাতে শুরু করলাম কম্বিনেশন লকের গোল উঁচু অংশটা। আবারও কিছুক্ষণ পর খট করে শব্দ শুনলাম। এভাবে দিক পরিবর্তন করে আরও ঠিক চারবার ঘোরানোর পরে জোরে কট করে শব্দ হলো।

অবশেষে উঠে দাঁড়ালাম। "বস, কাজ শেষ। ম্যানুয়াল লক খুলে গেছে। বাকি কাজটা শুমেলকে করতে হবে," স্বগর্বে ঘোষণা দিলাম।

কাজটা শুমেলকে গছিয়ে দেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ওর দক্ষতা। আমি যেমন ম্যানুয়াল লক খোলাতে দক্ষ, শুমেল তেমনি হ্যাকিংয়ে দক্ষ। ছোটবেলা থেকে বাবার প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও এই একটা জিনিস শখের বশে খুব ভাল রপ্ত করেছে। নিজের হাতে বানানো কিছু যন্ত্রও রয়েছে এসব কাজে আরও চমৎকার ফল পাওয়ার জন্য। সেগুলোর ভেতরে নিজেই প্রোগ্রামিং করে কিছু হ্যাকিং এলগরিদমও লোড করে রেখেছে। আজ হয়তো তারই কোনও একটা কাজে লাগবে। রঞ্জন যখন টিমটা তৈরি করেছিল তখন অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এক একজন লোক বাছাই করেছে। আমার আর শুমেলের মত, রাহাত আর কালুরও বিশেষ গুণ আছে। রাহাতের খবর জোগাড় করার ক্ষমতা অসীম। বারেক কালিয়ানের বাড়িতে যে একটা চুরি করা সম্ভব সেটা রাহাত না থাকলে হয়তো আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না। এর আগে আরও দুটো চুরি তার আনা খবরের ভিত্তিতেই পরিচালনা করে সফল হয়েছিলাম। আর কালু হচ্ছে টিমের পেশি। যখনই শক্তির প্রয়োজন হয় তখন তাকে দরকার। এই যে লোহার সিন্দুক, সেটা যদি কালু ধরতে আসে তাহলে কমপক্ষে তিনজন লোক কম লাগবে।

যাই হোক আমার কথা শুনে, রঞ্জন আশান্বিত চোখে শুমেলের দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

রঞ্জনের চোখের ভাষা বুঝে নিয়ে শুমেল দ্রুত কাজে নেমে পড়ল। ও কাঁধে ঝোলান ব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট ল্যাপটপ বের করলো, তারপর স্ক্রু-ড্রাইভারের টুল সেট উদ্ধার করল ব্যাগ থেকেই। এবারে স্ক্রু-ড্রাইভারের সেট থেকে উপযুক্ত টুল নিয়ে সেটা সিন্দুকের কি-প্যাড লকটা ধরে রাখা ফ্রেমের স্ক্রু-গুলোর উপর ব্যবহার করে চলল দক্ষ হাতে। দেখতে দেখতে সবগুলো স্ক্রু খুলে ফ্রেমটা আলগা হয়ে এল। এরপর শুমেল তার ব্যাগ থেকে আর একটা ছোট্ট ডিভাইস বের করলো, যার এক মাথাতে একটা পেন-ড্রাইভের মতো জ্যাক আর অপর পাশে লম্বা দুটো তামার তার ভিন্ন ভিন্ন ধাতব ক্লিপের সাথে সংযুক্ত। এই ডিভাইসটা শুমেলের নিজের আবিষ্কার।

শুমেল প্রথমেই কি-প্যাড ফ্রেমের পেছন থেকে বের হয়ে আসা দুটো তারকে ছুড়ি দিয়ে সামান্য কেটে তামার অংশটা বের করে নিল। তারপরে তামার বেরিয়ে আসা অংশ দুটোতে সেই ধাতব ক্লিপ লাগিয়ে দিল। সমস্ত কাজ হয়ে যেতেই শুমেল ল্যাপটপে লোড করে রাখা একটা প্রোগ্রাম চালিয়ে দিলো।

মুহূর্তের মধ্যে ওর বানানো প্রোগ্রামটা কাজ শুরু করল। সেটা প্রথমে সিন্দুকের লকটার প্রসেসরের সাথে একটা সংযোগ স্থাপন করে ফেলল, তারপর সেখানে প্রোগ্রাম থেকে একটা লজিক পাঠিয়ে পুরো অংশটার নিয়ন্ত্রন নিয়ে ফেলল। অবশেষে আমাদের দিকে মুখ তুলে শুমেল বলল,

"চার ডিজিটের লক, বেশিক্ষণ লাগার কথা না।"

বিশেষ আশা নিয়ে শুমেলের ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে রইলাম দুজন। সেখানে একটা উইন্ডোতে নানা রকমের সংখ্যা আর শব্দের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। কিছু সময় চলে যেতে একটা নম্বর স্থির হলো, '৭'। সংখ্যাটাকে স্থির রেখে বাকি সংখ্যাগুলো খুব দ্রুত এক এর পর এক পরিবর্তন হয়ে চলল, একটু পর দ্বিতীয় নম্বরটা স্থির হলো '৯'। এরও মিনিট পাঁচেক পেরিয়ে যাবার পর স্থির হল তৃতীয় নম্বর '৫' এবং সবশেষে আরও দুই মিনিট পরে সর্বশেষ নম্বর '৯' দৃশ্যমান হলো।

সর্বশেষ নম্বরটা বেরুতেই ল্যাপটপে চলতে থাকা প্রোগ্রামটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি শঙ্কিত চোখে শুমেলের দিকে তাকাতেই ও রহস্যময় হাসি দিয়ে ল্যাপটপের এন্টার বোতাম টিপে দিলো। অমনি ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে সিন্দুকের দরজাটা খুলে গেল।

তিনজনে অনেক আশা নিয়ে ভেতরে তাকালাম। সিন্দুকের ভেতরে দুটো অংশ। উপরের অংশে অনেকগুলো হাজার টাকার নোট। নোটের বান্ডিল আমাকে আর রঞ্জনকে আপ্লুত করে ফেলল। একসাথে এতগুলো টাকা হাতে চলে আসবে ছবি বিক্রির আগেই সেটা আসলেই কল্পনাতীত। শুমেল যদিও তেমন কোনও ভাব দেখাল না, এই টাকা তার বাবার সম্পদের তুলনায় কিছুই নয়। ও আমাদের দলে যোগ

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দিয়েছে শুধুমাত্র চুরির সময়ে যে উত্তেজনাটুকু পায় তার জন্য, টাকা-পয়সার লোভ নেই ওর। সেটা বোধ করি আমারই সবথেকে বেশি এই দলে। নাহ, মনে হয় কাল্লুর আমার থেকেও কিছুটা বেশি, যদিও রঞ্জনের সামনে সেটা প্রকাশ করতে চায় না। ওর একটাই ভয়, রঞ্জন যদি ওকে দল থেকে বের করে দেয় তাহলে সে কোথায় যাবে। কী খাবে?

রঞ্জন বলল, "তোরা টাকাগুলো জলদি ব্যাগে ভরে ফেল।"

আমি, শুমেল আর রঞ্জন মিলে টাকা তিনজনের ব্যাগে ভাগ করে ভরে নিলাম। টাকা নেওয়া শেষ হতেই রঞ্জন সিন্দুকের পরের অংশটার দিকে নজর দিলো। বুঝলাম এবার আবার আমার কাজ করার সময় এসেছে। সিন্দুকের নিচের এই অংশটাতেও একটা ছোট্ট দরজার উপর ম্যানুয়াল লক শোভা পাচ্ছে। কথা না বাড়িয়ে কাজে নেমে পড়লাম। এবারে লকটা খুলতে বেশি বেগ পেতে হলো না, লকের উপরে থাকা গোল চাকতিটাকে ডানে-বামে নির্দিষ্টভাবে তিনবার ঘোরানোর পরেই লকটা খুলে গেল।

ছোট্ট দরজার ওপাশ থেকে শুধুমাত্র একটা জিনিস দেখা গেল। আমরা হতভম্বের মতো সেই জিনিসটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

৬
সময়: বিকাল ০৩:১৩

বারেক কালিয়ানের বাড়ির কেয়ারটেকার রিহা আমাদের জন্য চা আনতে গিয়েছে অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এখনও ফিরে আসেনি। তাতে একদিক থেকে ভালই হয়েছে, ঘরটা তল্লাশি করে দেখার যথেষ্ট সময় পেয়েছি। বর্তমানে আমাদের সবার দৃষ্টি ঘরের একমাত্র বড় লোহার সিন্দুকের ভেতরে স্থির। সেখানেই একটা ছোট দরজার পেছনে থাকা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছি। জিনিসটা হচ্ছে একটা চাবি। সেই চাবি কী করে, কোন দরজা খোলে তার কিছুই জানি না। তবে যে বিষয়টা অবাক করছে সেটা হচ্ছে সিন্দুকের ভেতর ওটার উপস্থিতি। কেন একটা চাবিকে এত কঠিন সুরক্ষার পেছনে লুকিয়ে রাখা হবে, সেটাই রহস্য। আমি, রঞ্জন আর শুমেলের দিকে চোখ রেখে বুঝলাম ওরাও আমার মতো ঠিক একই জিনিস ভাবছে। রঞ্জন হাত বাড়িয়ে চাবিটা তুলে নিল।

চাবিটার সবথেকে বড় বিশেষত্ব, সেটা সাধারণ চাবির মতো এক মাথাওয়ালা নয়। বরং সেটার পাঁচটা মাথা। আর প্রত্যেক মাথায় ভিন্ন আকৃতির খাঁজ কাঁটা। ওটা তুলে নেবার পর রঞ্জন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল, তারপর খুব সাবধানে সেই হাল্কা সোনালী রঙের চাবিটা তার ব্যাগের ভেতরের দিকের একটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

চোখের সামনে থেকে ওটা সরে যেতেই আমরা তৎপর হয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি সিন্দুকটাকে আবার বন্ধ করে আগের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, না হলে রিহা এসে বুঝে ফেলতে পারে কিছু একটা গড়বড় আছে। আপাতত তাকে না বুঝতে দিলেই মঙ্গল। আমি আর শুমেল মিলে খুব দ্রুত কি-প্যাডের ফ্রেমটাকে আবার আগের জায়গাতে লাগিয়ে ফেললাম। সতর্কতার সাথে কম্বিনেশনে ম্যানুয়াল আর ইলেক্ট্রনিক দুটো লক-ই নিখুঁতভাবে করা শেষ হতে উঠে দাঁড়ালাম। শুমেল ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে ব্যাগে ভরে ফেলল, টাকাগুলোকে এক পাশ করে।

কাল্লুকে মোবাইলে নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো রঞ্জন।

এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে কেয়ারটেকার রিহা প্রবেশ করল। হাতে একটা ট্রেতে তিনটি সুদৃশ্য চায়ের কাপ, একপাশে প্লেটে কিছু গরম ধোঁয়া ওঠা শিঙ্গারা দেখা গেল।

রিহা একটা অপ্রস্তুত হাসি দিয়ে বলল, "দুঃখিত, আপনাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। আমাদের রাঁধুনি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তাই আমাকেই এগুলো বানাতে হয়েছে। একটু দেরি হয়ে গেল।"

BanglaBook.org

রঞ্জন বিনয়ী হাসি দিয়ে বলল, "আরে না না, অপেক্ষার কী আছে! আপনি কষ্ট করে নিয়ে এসেছেন সেটাই যথেষ্ট। তবে এসব না বানালেও পারতেন।"

শিঙ্গারা দেখে মন খারাপ হলো। আমার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আছে, তাই এসব ভাজা পোড়া খেতে পারি না, ডাক্তারের কড়া নিষেধ। বিরসভাবে তাকিয়ে দেখলাম, রঞ্জন আর শুমেল একটা করে শিঙ্গারা খেয়ে ফেলল টপাটপ।

রিহা আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার আপনি খাচ্ছেন না যে! ঠাণ্ডা হলে মজা পাবেন না।"

"না, ওটা আমি খেতে পারব না, আমার পেটে শিঙ্গারা সহ্য হয় না," হতাশার সাথে জানালাম।

রিহা কেমন একটা অভিযোগের সুরে বলল, "এটা বাসায় বানানো তো, খেয়ে দেখুন আমার মনে হয় কোনও সমস্যা হবে না। কম তেলে ভেজেছি।"

আমি কঠোরভাবে বললাম, "না।" কিছু জিনিস যেটা আমি করি না, সেটা কখনই করি না, নো ব্যতিক্রম। সুতরাং, রিহা যতই চাপাচাপি করুক, অনুরোধের ঢেঁকি গিলে আমার পক্ষে ওটা খাওয়া সম্ভব নয়। অপরদিকে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে শুমেল দ্বিতীয় শিঙ্গারায় কামড় বসাল। মনে মনে ওকে ধরে পাঁচতলা দালান থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেললাম কয়েকবার। এরকম একটা সুস্বাদু জিনিস মিস হয়ে গেল সেই দুঃখে বাঁচি না, আর হারামজাদা আয়েশ করে দেখিয়ে দেখিয়ে খাচ্ছে। ইচ্ছে করছে এখনই একটা থাপ্পর মারি গিয়ে শালার গালে।

দেখলাম রিহা কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি হালকা করতে ওকে তাড়া দিলাম, "চলুন, অন্য ঘরে গিয়ে টেলিফোনটা চেক করে দেখা যাক।"

রিহা দুর্বলভাবে বাঁধা দিলো, "কিন্তু, আপনার চা?"

কথাটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলাম। "ও, চা হবে পরে, শিঙ্গারাই খেতে পারলাম না! চা তেমন বড় কোনও বিষয় না, সকালে দুই কাপ খেয়েছি। তার থেকে আগে উপরটা দেখে আসি।"

এবারে আর রিহা আমাকে বাঁধা দেবার মতো কোনও কথা খুঁজে পেল না। দুই কাঁধ ঝুলিয়ে বলল, "আচ্ছা চলুন, উপরে যাওয়া যাক।"

রিহার পিছে পিছে ঘরের বাইরে পা রাখলাম। আমার এক কানে পকেটের মোবাইল থেকে আসা হেডফোনের একটা প্রান্ত লাগানো, গেঞ্জির ভেতরে থেকে টেনে তোলা হয়েছে সেটা। ওটাতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম রঞ্জন তার পরের নির্দেশটি দিচ্ছে কাল্লুকে।

রঞ্জন গম্ভির গলায় বলল, "কাল্লু, তোকে এবার পরের কাজটা করতে হবে। মনে আছে তো কি করতে হবে?"

কাল্লু ষড়যন্ত্রির মতো জবাব দিলো, "হু বস, সব মনে আছে। এখনই যাইতাছি মালিরে সিস্টেম করতে।"

BanglaBook.org

মনে পড়ে গেল পরিকল্পনার কথা। এই বাড়ির দুই কেয়ারটেকার, আর রাঁধুনি বাড়ির ভেতরেই থাকে। মালি এবং দারোয়ান থাকে বাইরে। তাদের জন্য আলাদা করে একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি বানিয়ে দেওয়া আছে বাগানের ধার ঘেসে। বাইরে থেকে যা বুঝেছিলাম সেখানে কমপক্ষে দু-তিনটে ঘর তো থাকবেই। তাছাড়া একটা বাথরুম থাকাও অসম্ভব কিছু নয়। তবে দারোয়ানের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে বাইরে, কারণ দরজা থেকে তার থাকার ঘরটা অনেক দূরে, সুতরাং বার বার সেখানে গেলে সমস্যা হতে পারে ভেবে শিল্পী এই ব্যবস্থা করেছেন। সেই টয়লেট থেকে মাঝে মধ্যে পানি ধরে গাছে দেয় মালি। পুরোটাই গুছিয়ে তৈরি করেছেন বারেক কালিয়ান। মালি আর দারোয়ান থাকে বলে যে সেই ছোট্ট বাড়ি কুৎসিত করে বানানো হয়েছে তেমন নয়, বরং সেটাও প্রধান বাড়িটার সাথে মানানসই করেই তৈরি। শিল্পী যে কোনও অবস্থাতেই রুচির সাথে আপোষ করেন না এটা থেকেই তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ হয়।

আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ি কাল্লু মালির ঘরে গিয়ে তাকে সেখানেই বেঁধে ফেলবে, এই কাজটা আরও কিছুক্ষণ আগেই তার করে ফেলার কথা ছিল। কিন্তু পরিকল্পনা বার বার বাঁধাগ্রস্ত হওয়াতে তাকে কিছু করতে নিষেধ করেছিল রঞ্জন। এখন সে আবার কাল্লুকে নির্দেশ দিয়েছে। ভালই করেছে, মনে হয় এটাই উপযুক্ত সময় মালিকে কব্জা করে ফেলার।

রিহাকে অনুসরণ করে ডান দিকে মোড় ঘুরতে ঘুরতে শুনলাম রঞ্জন কাল্লুকে আবারও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ব্যাপারে সতর্ক করে দিল। এরপরে সব চুপ চাপ হয়ে গেল, শুধুমাত্র কাল্লুর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে রিহা কথা বলল, "কি নাম আপনার?"

অপ্রস্তুতভাবে উত্তর দিলাম, "হিরন।"

"বাহ, বেশ সুন্দর নাম তো!" পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে ছোট্ট একটা হাসি দিলো মেয়েটা।

মনে মনে হাসলাম, আর একটু পরে রিহাকেও বেঁধে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। হয়তো অন্য কোনও সময় বা জায়গা হলে ওর সাথে ভিন্ন সম্পর্ক হতেই পারতো, কিন্তু আজ না! আজকে শুধুই কাজ, সেই কাজের মধ্যে কোনও রিহার জন্য বিন্দুমাত্র অনুভূতি থাকা সম্ভব নয়।

এরমধ্যেই শুনতে পেলাম মালির সাথে কথা বলা শুরু করেছে কাল্লু, "এই ভাই, তোমার নাম কী?"

মালি বিরক্তির সুরে বলল, "আপনে কে? আমার নাম দিয়া আপনের কাম কী?"

BanglaBook.org

কাল্লু তার স্বভাব বিরুদ্ধভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল, "আরে কাম আছে দেইখাই তো জিগাই, নাকি!"

"আচ্ছা, আগে আপনার নাম কন," মালি কঠিনভাবে কাল্লুকে বলল।

কাল্লু বলল, "আমার নাম কাল্লু। কি হইসে? তুমি এইবার তোমার নাম কও।"

"আমি মতি। কন, আমার লগে আপনের কী কাম?" ফুল গাছে পানি দিতে দিতে বলল মালি, চোখে রাজ্যের ক্রোধ।

গলার স্বরটা নিচে নামিয়ে কাল্লু বলল, "আরে মিয়া গোপন কথা, লও আগে ঘরের ভিত্‌রে যাই।"

"কীসের গোপন, এইহানে কন। আমি ভিতরে যামু না।" ওকে পাত্তাই দিলো না মালি।

কাল্লু রেগেমেগে নিচু গলায় কিছু গালি ঝাড়ল, পাওয়ারফুল মাইক্রোফোনে আবাছা শুনলাম। সামান্য বিরতির পর সামলে নিয়ে বলল, "আহা, মতি মিয়া তুমি বড় ঝামেলা করো তো! এইখানে যদি কওয়াই যাইত তাইলে কি আর তোমারে ভিত্‌রে যাইতে বলতাম!?"

কাল্লুর নাছোড়বান্দা ভাব দেখে অবশেষে মতি মালি মনে হয় ভেতরে যেতে রাজি হল। দায়সারাভাবে বলল, "আসেন।"

হঠাৎ রিহার ডাক শুনে মনোযোগ আবার করিডোরে ফিরে এল। সতর্ক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কীক্ক...কী বলছেন?"

রিহা মিষ্টি করে বলল, "না, মানে জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনি কতদিন ধরে এই কাজ করছেন?"

"তা বছর দু'য়েক হবে, আগে পোস্টিং ছিল বাগেরহাটে। কিছুদিন আগেই এখানের অফিসে যোগ দিয়েছি।"

"ও, আচ্ছা!" আমার কথার রেশ ধরে বলল রিহা। তারপরে আবার প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা, স্যারের রুমের টেলিফোন কি সারানো হয়ে গেছে আপনাদের?"

হেডফোনে কান রেখে জবাব দিলাম, "না, ওটার কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। আরও কিছুটা সময় লাগবে মনে হয়।"

আমার কথা শুনে মেয়েটা গম্ভিরভাবে বলল, "হুম।" এরপর একটা দরজার সামনে এসে থামল। আমাকে অনুসরণ করতে বলে দরজা খুলে সিঁড়ি ধরে উপরে চলল। ব্যাপারটা অদ্ভুত! সব সিঁড়িগুলোই দরজার পেছনে কেন? কিন্তু রিহাকে কিছু বললাম না, বরং পেছন পেছন সিঁড়ি ধরে হাঁটলাম।

উঠতে উঠতেই শুনতে পেলাম রঞ্জন আবার নিচু গলায় কাল্লুকে সতর্ক করে দিচ্ছে, "ভাল করে দেখে নিস ঘরে কোনও ক্যামেরা আছে কি না।"

BanglaBook.org

এই সিঁড়িটা দেখলাম আগেরটার মতো ঘোরানো না, বরং খাঁড়া উঠে গেছে তরতর করে। আলাপ চালাতে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা আপনি এখানে কতদিন হলো কাজ করছেন?"

রিহা কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল, তারপর বলল, "এই তো, হবে তিন-চার বছর।"

"ওরে বাবা এত দিন!" চমকে যাবার ভঙ্গি করলাম।

রিহা খিলখিলিয়ে উঠল। "এ আর এমন বেশি কী!" মাথা নেড়ে বলল।

আমি বললাম, "বেশিই তো! আমি একসাথে এত দিন কোথাও টানা কাজ করিনি।"

কথাটা শুনে রিহা হেসেই চলল। ওর হাসি শুনে মনে একরকম মায়া হলো আমার। ঠিক করলাম ওকে আর যা-ই করি মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করব না। সুন্দর একটা মেয়ে, মাথা ফুলে আলু হয়ে থাকলে দেখতেই বা কেমন লাগবে! তার থেকে বরং অন্য কোনও উপায় দেখা যাবে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি চলে আসতেই শুনতে পেলাম মালি মতির কণ্ঠস্বর, "এইবার কন, আপনার জরুরি কথাটা কী?"

কাল্লু ছাড়াছাড়াভাবে বলল, "আরে ভাই, এত তাড়াহুড়া কীসের, ভিত্‌রে যখন নিয়া আসছ তখন অবশ্যই বলব। তার আগে এক গ্লাস পানি নিয়া আসতো দেখি, বড্ড তিয়াস পাইছে।"

মতি গজগজ করতে করতে পানি আনতে গেল সম্ভবত। আমি কান পেতে খস খস শব্দ শুনতে পেলাম, বুঝলাম কাল্লু পুরো ঘরটা পরীক্ষা করে দেখছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার জন্য।

রঞ্জন আবার অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করলো, "কি-রে, ক্যামেরা আছে ওখানে?"

কাল্লু গলা নামিয়ে ছোট্ট করে জবাব দিলো, "নাই।"

এবারে রঞ্জন নির্দেশ দিলো, "তাহলে একশনে নেমে পড়, বেশি দেরি করলে হবে না। কাজ শেষ হয়ে গেলে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবি।"

এই আট মাস নজর রেখে জেনেছি, মালির কাছে একটা চাবি আছে, যেটা ব্যবহার করে সে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে। তবে ভেতরে ঢুকে সে ঠিক কী করে তা সম্পূর্ণ অজানা। সেটা জানতে হলে কাল্লুকেও ওটা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। কাল্লুকে এই কাজের জন্য বেছে নেবার উদ্দেশ্যও যথেষ্ট পরিষ্কার। যেহেতু ও আমাদের মধ্যে সবথেকে পেশিবহুল সুতরাং আচমকা কোনও বিপদ এসে পড়লে সেটার মোকাবিলা সবার থেকে ভাল ও-ই করতে পারবে।

BanglaBook.org

আমি আর রিহা যখন সিঁড়ির প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, ঠিক তখনই আবার হেডফোনে মালির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, "এই নেন পানি।"

শব্দ শুনেই বুঝলাম কাল্লু পানিটা ঢক ঢক করে পান করল। তারপর সজোরে একটা গ্লাস ভাঙার শব্দ হলো, আর সেই সাথে মালি মতির দিশেহারা কণ্ঠস্বর, "একি! এইটা কী করলেন, গ্লাস ভাঙলেন ক্যান?"

ওপাশ থেকে কাল্লুর কোনও জবাব পাওয়া গেল না। এরপর কিছুক্ষণ ধস্তা ধস্তির শব্দে বুঝলাম কাল্লু খেল শুরু করে দিয়েছে। কাল্লু কিছু বিশেষ কৌশলে সিদ্ধহস্ত। ও যে কারও গলাতে কিছুক্ষণ হাতের পেশি দিয়ে চাপ দিয়ে শ্বাস রোধ করে ফেলতে পারে। দম আটকে ওই ব্যক্তিকে ঠিক মেরে ফেলে না, শুধুমাত্র অজ্ঞান করার পর্যায়ে নিয়ে যায়। কাল্লুর এই বিশেষ ক্ষমতা রঞ্জনের দারুণ পছন্দ। খুন-খারাবি রঞ্জন একদম ভালবাসে না। তার কথা হচ্ছে আমরা 'সংগ্রহ শিল্পী,' সুন্দর প্ল্যান করে সংগ্রহ করব, তারপরে একজন প্রকৃত শিল্পীর মতো বুদ্ধি করে পালিয়ে যাবো। শুধু শুধু খুন-খারাবি করে হাত গন্ধ করব না। আমি যদিও নিজেদেরকে সরাসরি চোর বলতেই পছন্দ করি কিন্তু রঞ্জনের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত। নিজের হাত নোংরা না করে যদি কোনও কাজ করা সম্ভব হয় তাহলে সেটাই করা উচিৎ।

মনোযোগ দিয়ে কাল্লু আর মতির ধস্তা ধস্তির শব্দ শুনছিলাম হেডফোনে, ফের বাঁধ সাধল রিহা, "কী ব্যাপার! এত কী ভাবছেন?"

"ভাবছিলাম, আরও কতক্ষণ লাগবে কাজ শেষ হতে। সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফেরা দরকার।"

রিহা ভ্রুকুটি করলো, "কেন, বাড়িতে কেউ অপেক্ষা করে আছে নাকি?"

সতর্কভাবে জবাব দিলাম, "না, কে আবার থাকবে অপেক্ষা করে!"

"কেন, আপনার বউ," কাটাকাটাভাবে বলল রিহা।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে মাথা নাড়লাম। "আরে ধুর, আমার আবার বউ আসবে কোথা থেকে! এখনও তো বিয়েই হয়নি।" হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলাম কথাটা।

রিহা ঠোঁট উল্টে বলল, "তাহলে গার্লফ্রেন্ড!"

"না, তা-ও নেই।"

রহস্যময়ি হাসি দিলো ও, "আচ্ছা! তাই বুঝি!" ওর কথার মধ্যে প্রশ্রয়ের আভাস পেলাম।

এমন সময় কাল্লুর কণ্ঠ বাজল কানে, "বস, কাম হইয়া গেছে। ব্যাটারে বাইন্ধা রাখছি ঘরের একটা খাম্বার লগে।"

রঞ্জন আনন্দিত স্বরে বলল, "গুড, ভেরি গুড। এখন তুই ওই চাবিটা নিয়ে

BanglaBook.org

পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা কর। আমরা ততক্ষণে এই দিকটা গুছিয়ে ফেলছি। খুব সাবধান, ক্যামেরা লক্ষ্য করে ঢুকবি, বুঝলি?"

কাল্লু বাধ্য সৈনিকের মতো জবাব দিলো, "ওকে বস।"

রঞ্জন শুমেলকে বলল, "চল আমরা ছবিগুলো সাইজ করে ফেলি ও আসতে আসতে।"

পরিষ্কার বুঝতে পারলাম রঞ্জন আর শুমেল এখন ঠিক কী করতে চলেছে। আমাদের সবার কাঁধে ঝোলান ব্যাগে বেশ কয়েকটা করে প্যারাসুট কাপড়ের তৈরি থলে আছে, প্ল্যান মতো এখন ওরা ওগুলোই বের করে প্রত্যেকটা ছবি একটা একটা থলেতে ভরে ফেলবে। এরপর সেগুলোকে বেঁধে আলাদা করে রাখা হবে। কাল্লু হাজির হলে, সেগুলোকে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে নামিয়ে একটা বিশেষ জায়গাতে যাবে। জায়গাটা আমরা আগেই স্থির করে রেখেছি, সেটা হচ্ছে ওই মালির ঘর। যেহেতু সেখানে কোনও ক্যামেরা নেই, সুতরাং আমাদের পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসার কোনও কারণও নেই। ছবিগুলোকে একসাথে না বেঁধে আলাদা আলাদা করে নেওয়া হচ্ছে অক্ষত রাখার জন্য। এক একটা ছবি অমূল্য, সেগুলোতে কোনও খুঁত থাকলে ক্রেতা সঠিক দাম নাও দিতে পারে। অন্ততপক্ষে সেরকমটাই জানিয়েছে রাহাত আর শুমেল, বিদেশি ক্রেতার সাথে কথাবার্ত্রা ওরা দুজনে মিলেই বলেছে। রঞ্জনও একমত, দ্রব্য যত নিখুঁতভাবে ক্রেতার কাছে পৌছে দেওয়া যায় ততই ভাল।

এসব ভাবতে ভাবতে দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় ওঠার পর আমরা বাম দিকের ঘোরানো রাস্তা ধরে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। রিহা এখনও থামছে না। রঞ্জন আর কাল্লু যখন কাজ গুছিয়েই নিয়েছে কিছুটা তখন আমারও তৎপর হওয়া দরকার। ভেতরে ভেতরে বাড়তে থাকা তাগিদ টের পেলাম।

রিহাকে তাড়া দিলাম, "আমাদের আরও কতটা যেতে হবে?"

ও তাচ্ছিল্য করে বলল, "এমা, এরমধ্যেই হাঁপিয়ে গেলেন, নাহ আপনার তো দেখছি ধৈর্য খুবই কম।"

"সে হয়তো একটু কম, কিন্তু কাজটা তো দ্রুত শেষ করতে হবে তাই না!"

রিহা কপট রাগ দেখাল, "বার বার আপনি কেবল তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার কথা বলছেন! কেন, আমার সঙ্গ পছন্দ হচ্ছে না বুঝিং"

এবারেও ওর কথায় প্রশ্রয়ের আভাস পেলাম। আর পাশ কাটালাম না, সরাসরি ঠোঁটের কোনায় একটা হাসি ফুটিয়ে বললাম, "নাহ, আপনার সঙ্গ তো বেশ আকর্ষণীয় লাগছে।"

BanglaBook.org

রিহা ভুরু নাচাল, "তাই বুঝি?"

হাসিটা সমস্ত মুখে বিস্তৃত করলাম, "ঠিক তাই।"

এবার রিহা গলার স্বর একটু নিচু করে ফিস ফিস করলো, "প্রমান দিতে পারবেন?"

"সুযোগ পেলে প্রমাণ অবশ্যই দেব," আমিও ফিস ফিস করেই জবাব দিলাম।

রিহা মুখ টিপে হাসল, তারপরে হাঁটার গতিটা একটু বাড়িয়ে দিলো। আমিও তাল মিলিয়ে ওর পেছন পেছন চললাম।

আরও প্রায় দুই তিন মিনিট দ্রুত হাঁটার পর রিহা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতে ধরা চাবির গোছাটা থেকে একটা চাবি বেছে দরজার ফুটোটায় লাগিয়ে মোচড় দিতেই দরজাটা খুলে গেল। রিহা ভেতরে ঢুকে পড়ল, আমিও ওর পেছন পেছন ঘরটাতে ঢুকলাম। এই ঘরা শিল্পীর বেডরুম থেকে অনেক ছোট, প্রায় অর্ধেক হবে আয়তনে। ভেতর থেকে মিষ্টি জুই ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। ঘরের দেয়ালে কোনও প্রকার চিত্রকর্ম চোখে পড়ল না, তবে ঘরটা মোটেই অগোছালো নয়। একপাশের দেয়াল ঘেঁসে বেশ বড়সড় লোহার খাট পাতা। খাটের মাথার দিকের ফ্রেমটা বেশ উঁচু, সেখানে বড় বড় লোহা আঁকা বাঁকা করে সুন্দর নকশা করা। সুসজ্জার জন্য খাটের উপর পরিপাটি করে লাল সাদা ফুলের ছবি আঁকা চাদর বিছানো। প্রায় ধার ঘেঁসেই একটা ড্রেসিং টেবিল, আর তার ঠিক উল্টো দিকের দেয়ালের পাশে বড় আলমারি। সেটার দরজা খোলা থাকায় তার ভেতরের ঝোলানো মেয়েলি পোশাকগুলো খোলামেলাভাবে চোখে পড়ল। আলমারির পাশেই ছোট্ট ড্রেসিং টেবিল। ঘরের একপাশে বিশালাকার তিনটি জানালা, যার একটা খোলা। সেখান থেকেই দেখতে পেলাম দারোয়ানের পোশাক পরে রাহাত মনোযোগ দিয়ে দরজার পাশে তার ডিউটি করছে।

রাহাতের নিখুঁত ছদ্মবেশ দেখে মনে মনে মুগ্ধ হচ্ছিলাম ঠিক তখনই পেছন থেকে খুট করে আসা একটা শব্দে আমার চেতনা আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল। দেখলাম রিহা ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। আমাকে আরও অবাক করে খোঁপাটা খুলে ফেলল রিহা। বাঁধনমুক্ত ঘন কালো চুলগুলো দু'হাত দিয়ে ধরে এলোমেলো করলো, চুলগুলো কাঁধ ছড়িয়ে কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

রিহা আহবানের সুরে বলল, "এই নিন সুযোগ, দেখি কতটা প্রমাণ দিতে পারেন।"

কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে আদিম আকর্ষণে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম এক পা এক পা করে। রিহা শার্টের উপরের বোতামটা আলগা করে দিলো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে টের পেলাম, হাত দিয়ে মুছলাম। ওর কাছে পৌঁছানোর

BanglaBook.org

আগেই শার্টের দ্বিতীয় বোতামটাও আলগা করে ফেলল মেয়েটা। সহসাই লক্ষ্য করলাম দরজার ঠিক ধার ঘেঁসে একটা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা লাগানো রয়েছে, যেটা মোটামুটি আমার দিকেই ফোকাস করা। দ্রুত রিহার একদম কাছে চলে গেলাম, ওর শার্টে দুহাতে ধরে সজোরে টান দিলাম। মুহূর্তে বাকি বোতামগুলো ছিঁড়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। রিহা আবেগে আমার ঘাড় জরিয়ে ধরল, টের পেলাম হেডফোনটা কান থেকে সরে গেল। ওকে ডান হাতে জড়িয়ে ধরলাম, আর বাঁহাত দিয়ে ওর শার্টটা শরীর থেকে খুলে ফেললাম। এরপর রিহার ঠোঁট ঠোঁট লাগিয়ে আবেগ ভরা চুমু দিতে দিতে শার্টটাকে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ঠিক উপরে ছুঁড়ে দিলাম, ক্যামেরা শার্টের পেছনে ঢাকা পড়ে গেল। ততক্ষণে রিহা আরও গভিরভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে বিছানার দিকে ঠেলতে শুরু করেছে। দ্রুত প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে একটা রুমাল উদ্ধার করলাম। কিছুক্ষণ আগেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই রুমালে বিশেষ তরল ঢেলেছি, ক্লোরোফর্ম।

বিছানার কাছে পৌছতেই রিহা আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চাইল, আমি ফাঁকা হাতটা দিয়ে পড়তে পড়তে ওর স্কার্টের নিচের অংশটা খপ করে ধরলাম। আচমকা টানে স্কার্টের কিছুটা অংশ ছিঁড়ে আমার হাতে চলে এল। আমার বুকের উপর আছড়ে পড়ল রিহা। ওকে নিয়ে বিছানার পড়তেই হাত থেকে রুমালটা ছুটে বিছানার মাথা রাখার জায়গার কাছাকাছি গিয়ে পড়ল। বেগতিক দেখলাম। একটু একটু করে বিছানায় শরীরটাকে টেনে উপরের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। উপরে রিহা থাকায় সেটা করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। ও অবশ্য কোনও রকম বাঁধা দিল না, হয়তো এখনও রুমালটা খেয়াল করেনি! অথবা করলেও সেটার বিশেষত্ব বুঝে উঠতে পারেনি। আমি চোখ সরিয়ে এবার রুমালের দিকে নজর দিলাম, হাত বাড়িয়ে সেটাকে প্রায় ধরে ফেললাম। রিহা আমার অপর হাতটা নিয়ে ব্যস্ত, কাঁধ থেকে চুমু শুরু করে ও এখন একেবারে হাতের তালুতে পৌছেছে।

অবশেষে রুমালটা বা হাত দিয়ে ধরে ফেললাম।

এমন সময় অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, রিহা চুমু বন্ধ করে দিয়েছে। ও এখন আমার বুকের উপর স্থিরভাবে বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম নিশ্চয়ই কিছু সমস্যা হয়েছে। ডান হাতে রিহাকে ধরার চেষ্টা করতেই টের পেলাম সেটা আমার নির্দেশ মতো কাজ করছে না। আতংকের সাথে লক্ষ্য করলাম হাতটা একটা হাতকড়া দিয়ে দিয়ে খাটের মোটা লোহার শিকের সঙ্গে লাগানো। আরও দুবার অধৈর্য হয়ে জোরে টানলাম, কিন্তু তাতে হাতে ব্যথা পাওয়া ছাড়া বিশেষ কোনও লাভ হলো না।

যন্ত্রণায় নাক মুখ খিঁচিয়ে বললাম, "এটা কী রসিকতা হচ্ছে, রিহা? আমার হাত

BanglaBook.org

এখনই খুলে দাও।"

রিহা বুকের উপরে আরও চেপে বসল। "ওমা, এ-তো দেখি একবারে আপনি থেকে তুমি! হিরন সাহেবের আমাকে খুব আপন মনে হচ্ছে বুঝি?" ওর কণ্ঠে বিদ্রুপ স্পষ্ট।

আমি আবার তুমি থেকে আপনিতে ফিরে গিয়ে বললাম, "রিহা এরকম করে কথা বলছেন কেন?"

রিহা খিস্তি দিলো, "ওই শুয়োরের বাচ্চা, ভালয় ভালয় শিঙ্গারা আর চা খাইতে বললাম, খাইলি না; আবার জিজ্ঞাস করিস তোর সাথে এমন করে কথা বলি ক্যান? বেজন্মার পুত, ফ্রিতে মজা লুটতে চাও, তাই না?"

ফ্যাল ফ্যাল করে রিহার অর্ধনগ্ন শরীরটাকে অতিক্রম করে জ্বলতে থাকা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ আগের সেই লাবণ্যময়ি ভাবটা এখন সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে ওখান থেকে। সেখানে আমার জন্য শুধুই ঘৃনা ঝড়ে পড়ছে।

রিহা বলে চলল, "কুত্তা, ফোন সারতে আসার আর দিন পাও না! এত কষ্ট করে একটা প্ল্যান করলাম, 'বারেক' বিদেশে গেলেই ওর টাকা-পয়সা নিয়ে পালাব। আর তেনাদের আজকেই আসতে হইছে। তা আসছ ভাল। ভাবলাম শিঙ্গারা খাইয়ে অজ্ঞান করে আগে তোদের তিনটারে শায়েস্তা করব, আর পরে বাকি দুইটার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু কীসের কি! শালায় আবার নবাব, শিঙ্গারা খায় না। খাইস না শিঙ্গারা, এইখানেই বান্ধা থাক। আমরা টাকা নিয়া চলে যাবার পর, পুলিশ এসে তোদের মেরামত করবে, বুঝলি?"

ওদের পরিকল্পনা! তার মানে রিহা একা নয়, সাথে আরও কেউ আছে। কিন্তু কে! ফিরোজ? হবে হয়তো। এখন সেসব ভেবে নষ্ট করার মতো সময় নেই। আসলে রঞ্জন ঠিকই বলে কোনও কাজ পরিকল্পনার বাইরে করা উচিৎ না। অথচ আমরা দুজনেই পরিকল্পনার বাইরে কাজ করে ফেলেছি আজ। ও পরিকল্পনার বাইরের কাজ করেছে শিঙ্গারা খেয়ে, আর আমি করেছি রিহার সাথে এতদূর এসে। এর থেকে ওকে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেললেই হতো। বেশি দরদ দেখাতে গিয়ে এখন এই দশা! যাই হোক, এখনই আরও একটা কাজ করতে হবে পরিকল্পনার বাইরে, আর সেটা খুব দ্রুতই করতে হবে। রিহা ঘর থেকে চলে গেলে কাজটা আর করা যাবে না।

রিহা স্কার্টের নিচে কালো অন্তর্বাসের পেছন থেকে আরও একটা হাতকড়া বের করতে করতে বলল, "তিনটা হ্যান্ডকাফ ছিল, তোদের তিনজনের জন্য। দুটো তো তোর পেছনেই গেল, তবে সমস্যা নেই, আরও আছে স্টকে। তোর দুই গাধা

BanglaBook.org

সহকর্মি এতক্ষণে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে, ওদের বন্ধ করার ব্যবস্থা একটু পরেই করছি। কই দেখি তোর হাতটা দে তো..."

এতক্ষণে রিহার চোখ আমার খোলা হাতের দিকে পড়ল, হাতে শক্ত করে ধরে রাখা রুমালটা দেখতে পেল। সহসাই বুঝে ফেলল কী করতে যাচ্ছি, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি দুই পা দিয়ে রিহার কোমর পেঁচিয়ে ধরলাম, ওকে বিছানায় কাত করে রুমালটা নাকে ঠেকালাম। মাথাটা বিছানার উপর চেপে ধরলাম। আচমকা টান খেয়ে হাতকড়া লাগানো কব্জির কাছে বেশ কিছুটা জায়গা কেটে টপ টপ করে রক্ত পড়তে লাগল, পরোয়াই করলাম না। রিহার ছটফট করতে থাকা শরীরটার উপর আমার পায়ের বাঁধন আরও শক্ত করলাম। রিহা বেশ অনেকক্ষণ চেষ্টা করলো, কিন্তু মাথা কিংবা শরীর কোনটাই বাঁধন মুক্ত করতে পারল না। ধীরে ধীরে ও অসাড় হয়ে পড়ল।

আমি কোনও প্রকার ঝুঁকি নিলাম না, রিহা সম্পূর্ণ নেতিয়ে পড়ার পর আরও প্রায় মিনিট তিনেক ওই ক্লোরোফর্ম লাগানো রুমালটা ওর নাকে চেপে ধরে রইলাম। তারপর বিছানার পড়ে যাওয়া হাতকড়াটা উঠিয়ে নিয়ে সেটাকে প্রথমে ওর এক হাতে পরালাম, তারপরে ঘুরিয়ে খাটের বাঁকানো শক্ত লোহার একটা রেলিংয়ের ওপাশ থেকে নিয়ে হাতকড়ার বাকি অংশটা ওর অপর হাতে আটকে দিলাম। এবারে জ্ঞান ফিরলেও সহজে মুক্ত হতে পারবে না। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে আমিও মুক্ত হতে পারছি না। হাতকড়া যেভাবে শক্ত করে হাতের উপর বসে গেছে তাতে ওটা থেকে হাত গলিয়ে বের করার কোনও উপায় নেই। তাছাড়া, রিহার পরনে যেটুকু পোশাক বাকি রয়েছে তার মধ্যেও কোনও চাবির সন্ধান পেলাম না। নেহাত হাতকড়াটা অটোলক সিস্টেম ছিল দেখে রিহাকে আটকে ফেলা গেছে। আমি একরাশ হতাশ নিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রিহার পাশে বিছানাতে শুয়ে রইলাম।

BanglaBook.org

৭
সময়: বিকাল ০৪:১৯

রিহাকে অজ্ঞান করে আটকে ফেলার পরে আরও দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে, এখনও সটান বিছানায় শুয়ে আছি। আপাতত কানে হেডফোন লাগানো। রিহার ধাক্কায় সেটা খুলে গিয়েছিলো, আমি আবার গেঞ্জির ভেতর হাত ঢুকিয়ে তুলে এনেছি। রঞ্জন আর শুমেলের কোনও কথা শোনা যায়নি এরমধ্যে, সম্ভবত এতক্ষণে ওরা অজ্ঞান হয়ে গেছে। থেকে থেকে অবশ্য কাল্লুর গলা শোনা যাচ্ছে, ওর দিশেহারা অবস্থা। এই নিয়ে চার বার কাল্লু কথা বলার চেষ্টা করেছে। প্রথমবার রঞ্জনের সাথে,

"বস! আমি ভিত্‌রে ঢুইকা গেছি। এখন কী করুম?"

এই কথার উত্তরে রঞ্জন বলেছিল, "সাবধানে, দেখে শুনে চলবি! এখানে জায়গায় জায়গায় ক্যামেরা। আমরা দোতালার একটা ঘরে আছি। ঘরের দরজায় হাতি ঘোড়া নকশা করা। উল্টো দিকের দেয়ালে দেখবি বড় একটা ছবি আছে, ট্রেনের জানালা দিয়ে এক মহিলার বাইরে তাকিয়ে থাকার দৃশ্য। সেই ঘরটাতে ঢুকে পড়বি, আগে এখানের ছবিগুলো সরাতে হবে, তারপর অন্য ঘরগুলোর ব্যবস্থা করা যাবে।"

দ্বিতীয়বার কাল্লুকে কথা বলতে শুনে বুঝলাম সে বারেক কালিয়ানের শোবার ঘরটা খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু রঞ্জন আর শুমেলকে সেখানে পায়নি। কাল্লুর অবাক কণ্ঠস্বরে শোনা গেছিল, "একি! বস কই! ঠিক ঘরে আইলাম তো!? বস! বস! ধুৎ কথাও তো কয় না! কী ঘটনা? হিরণ! হিরণও তো কথা কয় না। রাহাত, ও রাহাত শুনতে পাস কিছু?"

রাহাত একটু চিন্তিতভাবে জবাব দিয়েছিল, "হুম পাচ্ছি। কী ঘটনা? ওদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছিস না?"

কাল্লু হতাশভাবে বলেছিল, "না, কই? কেউ তো নাই ঘরে!"

রাহাত গম্ভিরভাবে বলেছিল, "তুই ঠিক ঘরে গিয়েছিস তো?"

"হুম ঠিক ঘরেই আসছি। বাইরে ওই ছবি আর দরজায় ওই নকশা আছিলো তো!" নিশ্চিতভাবে বলেছিল কাল্লু।

এরপর কিছুক্ষণ অসহ্য নিস্তব্ধতা।

"মনে হচ্ছে কোনও ঝামেলা হয়েছে, তাই কথা বলতে পারছে না। তুই এক কাজ কর, হিরণ ওই মেয়েটার সাথে উপরে গেল না! তুই ওখানে উঠে ওকে খোঁজার চেষ্টা কর। কিন্তু সাবধান, যদি আসলেই কোনও বিপদ হয় তাহলে কিন্তু সেটা তোর

BanglaBook.org

আর আমার উপরেও এসে পড়তে পারে। ভালভাবে দেখে শুনে কাজ করবি।" সতর্ক করে দিল রাহাত।

এরপর কাল্লু বিভ্রান্তভাবে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুইও উপরে চইলা আসলে ভালো হইতো না?"

রাহাত দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিয়েছিল, "না, আমি প্ল্যানমতো কাজ শেষ করেই আসবো।"

ওর এই সিদ্ধান্তে একমত ছিলাম, রঞ্জন হলেও একই কথা বলতো। যত যা-ই হোক, পরিকল্পনা পরিবর্তন করা চলবে না, কোনোভাবে না।

এরপর কাল্লু আর কোনও কথা বলেনি। তবে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল সেটা দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনে বুঝেছিলাম।

সেই থেকে অপেক্ষা করছি, কখন কাল্লু এসে এখানে পৌছাবে। তবে, যখন কাল্লু আমার নাম ধরে ডাকছিল তখন তাকে কোনও উত্তর না দেওয়ার একটা কারণ আছে। রঞ্জন আর শুমেলকে শিল্পীর ঘরে পাওয়া যাচ্ছিল না, তার মানে নিশ্চয়ই কেউ ওদের সেখান থেকে সরিয়ে ফেলেছে। আর সেটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে একটা সম্ভাবনা থেকেই যায় যে ব্যক্তি তাদের সরিয়ে ফেলেছে সে নিশ্চয়ই আমাদের যোগাযোগের এই পদ্ধতিটা এতক্ষণে ধরতে পেরে গেছে। আর সে যখন এখনও আমাকে ধরতে এই ঘরে আসেনি তখন সে ধরেই নিয়েছে রিহা আমার একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা চালাচ্ছে, অথবা এতক্ষণে আটকে ফেলেছে। সুতরাং, আমি যদি তখন কিছু বলতাম তাহলে আমাকে ধরতেও এতক্ষণে কেউ না কেউ এখানে চলে আসতো। কেউ এলে আমি বাঁধা দিতে পারতাম না। নিজেকে মুক্ত করার কোনও উপায় এখনও পাইনি। তাই চুপ করে কাল্লুর জন্য অপেক্ষা করছি।

আরও কয়েকবার শুনতে পেলাম কাল্লু দরজা খুলছে আর বন্ধ করছে। কীভাবে ও দরজা খুলছিল কে জানে!

ঘরের একপাশে মেঝেতে পড়ে থাকা রিহার চাবির গোছাটার দিকে করুণভাবে তাকিয়ে রইলাম। তাও ভাগ্য ভালো যে দরজাটা খোলা, নাহলে এই দরজা দিয়ে কাল্লুর ঢোকার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

কাল্লুর সিঁড়ি দিয়ে ওঠার শব্দ পেলাম, টক টক টক টক। এরপর আবার একটা দরজা খোলার শব্দ এল।

শুনলাম, কাল্লু বিরক্ত হয়ে বলল, "শালার হিরু, ওই মেয়েডারে নিয়া কোথায় যে গ্যাছে কে জানে! ফূর্তি করার আর টাইম পায় না। কথাও কয় না, কী আজিব সমস্যা!"

দাঁত দাঁত পিষলাম, কাল্লুর বাচ্চা আমার অবস্থায় থাকলে বুঝতো কত ধানে

BanglaBook.org

কত চাল। ভালোই নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-ঘরে সে-ঘরে, ওদিকে আমাদের উপর দিয়ে যে কী বিপদ যাচ্ছে তার কোনও ধারনাই নেই ব্যাটার। এজন্য ওকে অবশ্য কিছুই করা সম্ভব না, ওর গায়ে যা জোর তাতে ওর সাথে লাগতে যাওয়াটাই বোকামি। না হলে এখান থেকে মুক্তি পেলেই ওর পেছনে লাথি বসাতাম। কত ফুর্তি করছি সেটা টের পেত হারামাজাদা।

বেশি শক্তিশালি লোকের সাথে মারামারি করতে যাই না আমি। ছোটবেলায় একবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। ঘটনাটা বেশ মজার।

আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। স্কুলের আর পাঁচটা ভাল ছেলের মতই চেষ্টা করি সামনের বেঞ্চে বসতে। পরিপাটি করে সঠিক ড্রেস পরি। অর্থাৎ, স্কুলের অনুমোদিত সাদা শার্ট, হালকা নীল রঙের ফুল প্যান্ট আর সাদা জুতো পরে স্কুলে যাই। একদিন হলো কী, সে দিনও আমি ঠিক ঠাকভাবেই স্কুলে গিয়ে প্রথম সিটে বসেছি। প্রথম ক্লাস শেষ হলো, দ্বিতীয় ক্লাস শেষ হলো, কিন্তু তৃতীয় ক্লাসে কোনও এক অজানা কারনে স্যার ক্লাস নিতে এল না। তখন আবার ক্লাসে কিছু দুষ্টু ছেলে ছিল, ওই যেমন সব স্কুলেই সব ক্লাসেই থাকে। কোনও কারনে যদি ক্লাস বাতিল হয়ে যেত তা হলে ওরা যা ইচ্ছে তাই করতো। আর বলাই বাহুল্য সেটাতে বাঁধা দেবার মতো কেউ থাকতো না পরের ক্লাস শুরু হবার আগে পর্যন্ত। যারা ক্লাসের ক্যাপ্টেন ছিল তারা পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে থাকতো নিজেদের সিটে। আমি অবশ্য ক্যাপ্টেন-ট্যাপ্টেন কিছু ছিলাম না, সাধারণ ছাত্র ছিলাম।

সে দিনও বরাবরের মতই গোবেচারা হয়ে বসে ছিলাম মাঝখানের সারির একদম প্রথম বেঞ্চে, এমন সময় সেই দুষ্ট ছেলের দল খেলা শুরু করে দিলো। প্রথমে তেমন কোনও সমস্যা হলো না, আমিও মজা নিয়েই ওদের খেলা দেখছিলাম। দারুন খেলা, একজনের শার্টে আরেকজন কলম দিয়ে দাগ দেয়। কারও শার্টে একটা দাগ পড়লে সে পরের জনের শার্টে দুটো দাগ দেয়, এভাবেই খেলা কিছুক্ষণ চলল। কিন্তু যখন খেলার সময় প্রায় শেষ হয়ে এল, অর্থাৎ পরের ক্লাস শুরু হবে হবে ভাব, ঠিক তখনই একজনের মনে হলো আমার শার্টেও দাগানো দরকার। ওমনি ছেলেটা এল, আর আমার শার্টের ওপর কী একটা লিখে দিয়ে চলে গেল! বাঁধা দেবার হালকা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওর যেরকম ষণ্ডা-গণ্ডা স্বাস্থ্য ছিল তাতে সুবিধে করতে পারিনি।

লেখাটা বুকের ঠিক উপরের দিকে লিখেছিল দেখে পড়তেও পারিনি, ভেবেছিলাম টিফিনের সময় পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলব। ঠিক তখনই স্যার এসে ক্লাসে ঢুকলেন। স্যারের নাম ছিল 'বর্ষণ', তবে ছাত্ররা চুপিচুপি তাকে ফাজলামি করে 'ধর্ষণ' বলতো। এটা স্যার আন্দাজ করতে পারতেন কিন্তু কাউকে

BanglaBook.org

সামনা-সামনি বলতে শোনেননি দেখে কোনও ব্যবস্থাও নিতে পারেননি। তো এই স্যার ঢুকলেন চতুর্থ ক্লাসে, টিফিনের আগে সেটাই ছিল সর্বশেষ ক্লাস। সবাই ঢিলেঢালাভাবে বসে ছিল। স্যার ক্লাসে ঢুকতেই আমরা উঠে দাঁড়ালাম। এটা ছিল সব ক্লাসের অঘোষিত নিয়ম, ক্লাসে শিক্ষক আসা মাত্র সব ছাত্রকে উঠে দাঁড়াতে হবে। স্যার এসেই তার চেয়ারে বসে পড়লেন, আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা ছিল আমার বেঞ্চের একদম মুখোমুখি। এরপর স্যার হাসিমুখে হাত নাড়িয়ে সব ছাত্রদের বসার নির্দেশ দিলেন।

বসতে বসতেই লক্ষ্য করলাম তিনি সোজা আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। যখন বসে পড়লাম ততক্ষণে দেখি তার হাসিটা পুরোপুরি গায়েব হয়ে সেখানে এখন একটা গম্ভির ভাব চলে এসেছে। তিনি আমাকে ডাকলেন, 'হিরন, এদিকে আয়।'

ডাক শুনে স্যারের কাছে এগিয়ে গেলাম। উনি কঠিন গলায় বললেন, 'ভদ্রতা জিনিসটা কিছু কিছু মানুষ এমনতেই শিখে ফেলতে পারে। কিন্তু যারা পারে না তাদেরকে কি করতে হয় জানিস?'

আমি বিভ্রান্তের মতো এদিক থেকে ওদিক মাথা নাড়লাম। উনি দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, 'তাদের এভাবে শেখাতে হয়।'

এই বলে উনি লম্বা কঞ্চির বেত দিয়ে শপাং শপাং মারতে লাগলেন। মারতে মারতে আমার শার্টটাই ছিঁড়ে ফেললেন। আমি চিৎকার করতে করতে হতভম্বের মতো মার খেয়ে চললাম। সেই মারের ব্যথায় পরের তিন দিন ঘুমাতে পারিনি। বাসা থেকেও কোনও প্রকার সহানুভূতি আদায় করতে পারিনি। সেজন্য পরিবারকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ বাসায় গিয়ে শার্ট খুলতেই লেখাটা পরিষ্কার দেখেছিলাম। লেখা ছিল 'বর্ষণ = ধর্ষণ'।

তিন দিন পর যখন স্কুলে ফিরলাম, গিয়েই সেই ছেলেটাকে ধরলাম। ওর শার্টের কলার জাপটে ধরে বললাম, 'তুই আমার শার্টে বাজে কথা লিখলি কেন? বল, কেন?'

হিতে বিপরীত হলো। ও-ই উল্টো আমার কলার ধরে মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উপরে তুলে ফেলল, তারপর ক্লাস রুমের দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরে বলল, 'লিখেছি বেশ করেছি, ইচ্ছে হলে আবার লিখব। যদি আমার সাথে লাগতে আসিস, তোরে মেরে তক্তা বানাই দিব।'

ক'দিন আগেই স্যারের হাতে তক্তা হয়ে ভাল শিক্ষা হয়ে গেছে, তাই আরও একবার তক্তা হবার ঝুঁকি নিতে পারলাম না। ভালোয় ভালোয় ওর কলার ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'সরি, তোর সাথে মারা-মারি করতে যাওয়া আমার উচিৎ হয় নাই।'

ওই ছেলের মনে হয় আমার প্রতি দয়া হলো, আর না হলেও স্যার আমাকে কী

BanglaBook.org

মারটা মেরেছিল সেটা ক্লাসের সবার মতো সে-ও দেখেছিল। তাই আমাকে সে যাত্রা রেহাই দিয়ে দিলো।

এই ঘটনার পর থেকেই আমি আর শক্তিশালি লোকদের সাথে একদম মারামারি করার ঝুঁকি নিতে যাই না। যেখানে নিশ্চিত লাঞ্ছনা সেখানে মাথা গলিয়ে কী লাভ!

মানুষের মস্তিষ্ক খুব আজব উপায়ে কাজ করে, হয়তো সে কারনেই এই বন্দি দশায় থেকেও সব আজে বাজে স্মৃতি মনে আসছে। কিন্তু, কাল্লু তো এখনও এসে পৌছাল না! কোনও বিপদে পড়ল না তো আবার? ওর পায়ের শব্দটাও থেমে গেছে কিছুক্ষণ হলো।

এতক্ষণে একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার সুযোগ পাচ্ছি। টানা উত্তেজনায় ভুলেই গিয়েছিলাম আমার প্যান্টর পকেটেই এমন একটা জিনিস আছে যেটা আমাকে হয়তো মুক্তি দিতে পারে। ছদ্মবেশের ব্যাপারটা আরও পাকা করতে গিয়েই জিনিসটা সাথে নিতে হয়েছিল, এভাবে কাজে লেগে যাবে কে জানতো!

প্যান্টের ডান হাঁটুর কাছের একটা পকেট থেকে বড় সাইজের প্লায়ার্স বের করলাম। হয়তো এটা দিয়ে চেপে হাতকড়ার একটা অংশ ভেঙে ফেলা সম্ভব। চেষ্টা শুরু করলাম। হাতকড়ার মাঝের শেকলের অংশটাকে প্লায়ার্সের দুই দাঁতের মাঝে রেখে সজোরে চাপ দিলাম। তাতে বেশি কিছু লাভ হলো না, শেকল শুধুমাত্র একটু বেঁকে গেল। হাল ছাড়লাম না, এটাই এখন শেষ ভরসা। প্লায়ার্সটাকে মুঠো করে ধরে মাথাটা দিয়ে হাতকড়ার বেঁকে যাওয়া অংশের উপর ক্রমাগত বাড়ি দিয়ে চললাম। একটু একটু করে একটা শেকলের জোড়াটা কিছুটা আলগা হয়ে এল। এবারে বাম দিকের হাঁটুর কাছের পকেটটা থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভার উদ্ধার করলাম। স্ক্রু ড্রাইভারের লম্বা চ্যাপ্টা ফলাটা সেই আলগা হওয়া জায়গা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম। আমার আটকে থাকা হাতটা দিয়ে হাতকড়ার অংশটুকু খাটের রেলিংয়ের সাথে সমান্তরালভাবে চেপে ধরলাম। যাতে হাতে কোনও আঘাত না লাগে শেকলে সহসা টানের ফলে। এবারে প্লায়ার্সের মাথাটাকে হাতুড়ির মতো ব্যবহার করে স্ক্রু ড্রাইভারের হাতলের উপর জোরে জোরে বাড়ি বসালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকাটা আরও বড় হয়ে এল। পুরোপুরি আলগা হতেই হাতে লেগে থাকা হাতকড়ার অংশটুকু ছাড়িয়ে নিলাম। হাতে ঝুলে রইল অর্ধেক হ্যান্ডকাফ।

কব্জি থেকে ক্রমাগত রক্ত ঝরছে তবুও মুক্ত হওয়ায় আত্মবিশ্বাসি বেড়েছে। দ্রুত খাট থেকে নেমে পড়লাম। দরজার কাছে গিয়ে মেঝে থেকে রিহার চাবির গোছাটা তুলে নিলাম। সেটা উল্টে পাল্টে হতাশ হতে হলো, সেখানে হাতকড়া খোলার জন্য কোনও চাবি নেই। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার উপর ঝুলতে থাকা রিহার শার্টের পকেটেও সাবধানে খুঁজে দেখলাম। চাবির দেখা পেলাম না। হতাশভাবে

BanglaBook.org

রিহার দিকে তাকালাম, ওকে এভাবেই আপাতত আটকে রেখে যেতে হবে। আমি আলমারি থেকে কিছু কাপড় তুলে এলোমেলোভাবে ওর শরীরে ছড়িয়ে দিলাম, এভাবে ওকে অর্ধনগ্ন দেখতে খুব একটা ভাল লাগছিল না!

জানালার কাছে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা ব্যাগটা আবার কাঁধে তুলে নিলাম। বাইরে চোখ পড়তেই দেখলাম রাহাত এখনও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জানালা থেকে সরে ঘরের একমাত্র দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। ঘর থেকে বের হবার সময় হয়ে এসেছে, তবে সেটা করতে হবে খুব সাবধানে, অনেক সতর্কতার সাথে।

BanglaBook.org

৮

সময়: বিকাল ০৫:০১

ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসেছি প্রায় পনেরো মিনিট আগে। ওখানে যেটুকু সময় ছিলাম তার পুরোটাই ছিল দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা। ঘরটা কার সে সম্পর্কে কেবলমাত্র ধারণা করা যায়, কিন্তু নিশ্চিত হয়ে কিছুই বলা যাবে না। ঘরের সাজসজ্জার ধরন আর আলমারির পোশাক দেখে ধারণা করা যায় ওটা রিহার ঘর। আমি ঘরের সম্ভাব্য মালিকিনকেও সযত্নে সেখানেই আটকে রেখে এসেছি। রিহা এখনও কিছুই টের পায়নি। ওর জ্ঞান ফিরতে আরও ৩-৪ ঘণ্টা লাগবে কমপক্ষে। এই সময়ের মধ্যেই খুঁজে পেতে হবে রঞ্জন আর শুমেলকে, সতর্ক করতে হবে কাল্লু আর রাহাতকে, শায়েস্তা করতে হবে রিহার বাকি সঙ্গি বা সঙ্গিদের।

এত কিছু কীভাবে করব জানি না। আপাতত ভাবতেও চাইছি না।

ঘরটা থেকে বের হবার পর সময় নষ্ট না করে সেটার দরজা বাইরে থেকে লক করে দিয়েছি, চাবি ছাড়া ওই ঘরে এখন আর কেউ ঢুকতে পারবে না। সম্ভবত ফিরোজ বা যে-ই রিহার সঙ্গি হয়ে থাক না কেন, এই বাড়ির সব ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে রয়েছে। তা থাকুক, যেটুকু সতর্কতা নেওয়া সম্ভব তাতে কোনও ত্রুটি রাখলে চলবে না।

দরজার বাইরে আরও মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে রইলাম, যদি কাল্লু চলে আসে সেই ভরসায়। শেষ পর্যন্ত কাল্লুর টিকিটাও দেখা গেল না, যদিও হেডফোনে স্পষ্ট ওর সিঁড়ি ধরে চলার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ব্যাটা তা হলে গেল কই? দোতলা থেকে সঠিক সিঁড়ি দিয়ে তিনতলাতে উঠে এই ঘরে পৌঁছতে এতটা সময় কোনওভাবেই লাগার কথা না!

আরও মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর দরজার সামনে থেকে সরে পড়লাম, এক জায়গাতে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ না, যে কোনও সময় রিহার সাহায্যকারি কেউ চলে আসতে পারে। সতর্কতার সাথে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার উপস্থিতির কথা মাথায় রেখে করিডোর ধরে এগিয়ে চললাম। এই তিনতলা বাড়িতে মোট ঘরের সংখ্যা কয়টি হবে অনুমান করা অসম্ভব, কারণ প্রতিটি ঘরের আয়তন ভিন্ন। কোনও ঘর বিশাল বড়, আবার কোনটা খুব ছোট। তবে বিশেষ ঘরগুলোর দরজার উপর করা নকশা সেগুলোকে সাধারণ ঘর থেকে আলাদা করে তুলেছে। শিল্পী বারেক কালিয়ান নিজের ঘর সাজাতে যথেষ্ট পরিমানে অর্থ

BanglaBook.org

ব্যায় করলেও সবগুলো ঘরকে তিনি সম্ভবত সাজিয়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করেননি। কেবল মাত্র বিশেষ ঘরগুলোর সাজসজ্জার দিকে নজর দিয়েছেন। আমি পরপর আরও কয়েকটি ঘরে ঢুকে ধারনাটা সত্যি বলে উপলব্ধি করলাম। চাবির গোছা থেকে প্রতিটি ঘরের জন্য সঠিক চাবিটি খুঁজে বের করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। প্রতিবার কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয়টা ভুল চাবি তুলতে হচ্ছিল প্রতিবার একটা সঠিক চাবি পেতে।

এখন যে ঘরটায় আছি সেটা একটা ছোট খাটো লাইব্রেরির মতো। শিল্পী যে বই পড়তে ভালবাসেন তা জানা ছিল না। তবে, লাইব্রেরি আছে মানেই যে লাইব্রেরি নির্মাতার বই পড়ার শখ রয়েছে এটাও জরুরি না। অনেকে আছে খেয়ালের বশে লাইব্রেরি তৈরি করে ঠিকই, কিন্তু জীবনে সেখান থেকে একটা বইও ছুঁয়ে দেখে না। আবার অনেকে আছে যারা বাড়ির আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য একটা লাইব্রেরি বানিয়ে রাখে। তবে পৃথিবীতে বইকে ভালোবেসে লাইব্রেরি বানানোর লোকের সংখ্যাই বোধহয় এখনও কিছুটা বেশি।

লাইব্রেরির ঘরটিতেও কোনও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা খুঁজে পেলাম না। বোধকরি বারেক কালিয়ান গুরুত্বপূর্ণ ঘরগুলো যেমন নিজের হাতে সাজিয়েছেন তেমনি সেখান থেকে ক্যামেরা জিনিসটাও নিজের স্বচ্ছন্দের জন্য বাদ দিয়েছেন। ক্যামেরা না লাগানোর পেছনে আরও হাজারটা যুক্তি থাকতেই পারে, সেগুলো নিয়ে এখন ভাবাতে ভাল লাগছে না।

ক্যামেরার অনুপস্থিতির ঘটনাটা নিশ্চিত হবার পরে, লাইব্রেরিটা একটু একটু করে ঘুরে দেখা শুরু করলাম। সেখানে বিভিন্ন রকমের বইয়ের সমাহার। এটা তৈরি করতে যে অনেক টাকা খরচ হয়েছে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। শিল্পীর টাকার অভাব নেই সুতরাং এটুকু খরচ তার জন্য বিশাল কোনও ঘটনা নয়।

বইয়ের তাকগুলো ঘেঁটে শিল্প, সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সংক্রান্ত বই খুঁজে পেলাম। নিঃসন্দেহে এই লাইব্রেরি যে সাজিয়েছে তার রুচি খুবই উন্নত পর্যায়ের। কিন্তু আমি যে কারনে সমস্ত লাইব্রেরিটা মনোযোগ দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম সেটা কেবলমাত্র বই না। লাইব্রেরির দেয়ালে লাগানো ছবিগুলোর প্রতিই বেশি আগ্রহি আমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বারেক কালিয়ানের আঁকা আরও প্রায় গোটা চারেক ছবি পেয়ে গেলাম। ব্যাগ থেকে প্যারাসুট কাপড়ের তৈরি কয়েকটা থলে বের করে ছবিগুলোকে দেয়াল থেকে নামিয়ে সুরক্ষিতভাবে বেঁধে লাইব্রেরির এক কোনায় আড়াল করে রাখলাম। কালু যদি এসে না পৌছায় তাহলে রাহাতকে সাথে নিয়ে এগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

BanglaBook.org

রাহাতের কথা মনে হতেই লাইব্রেরির জানালায় উঁকি দিলাম। রিহাকে আটকে রাখা ঘরের জানালা থেকে যেমন রাহাতকে দেখা যাচ্ছিল এখান থেকেও দিব্যি দেখা যাচ্ছে। ও এখনও দরজার সামনে একাগ্র দারোয়ানের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কলেজের দিনগুলোতে ওকে এই কাজ কেউ করতে বললে ঘুষি মেরে তার নাক ফাটিয়ে দিত নির্ঘাত। বরাবরই রাহাত সকলের থেকে একটু আলাদা থাকতে চাইত। কোনও ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চাইত না, কারও সাথে খুব একটা খাতিরও ছিল না ওর, এমনকী আমার সাথেও না। রঞ্জনের দলে ঢোকার জন্য যে ও আমাকে সাহায্য করবে সেটাও ছিল কল্পনাতীত!

এ ঘরটা থেকেও চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে, ফিরোজকে খুঁজে বের করা দরকার না হলে কাজ সামাল দেওয়া যাবে না। ঘরের দরজার কাছে গেলাম। হাতলে হাত রাখতেই হেডফোনে রাহাতের গলা শুনতে পেলাম, "গাড়ি চলে এসেছে!"

কাল্লু এই কথার সাথে জবাব দিলো, "বাহ! তাইলে কামটা তাড়াতাড়ি শেষ কর।"

এতক্ষণ পর কাল্লুর কণ্ঠ শুনতে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম, যাক এখনও শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়েনি গবেটটা। অবশ্য ওকেই বা গবেট বলে কী লাভ! রঞ্জন আর শুমেল দুটোও তো কম গবেট না, শিঙ্গারা পেয়েই কপা কপ খেতে হবে, তাই না? যত্তসব!! দরজার হাতল থেকে হাত সরিয়ে ফের জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ততক্ষণে রাহাত দরজা খুলতে শুরু করেছে। দরজা সম্পূর্ণ খুলে যেতেই গাড়িটা হর্ন বাজাতে বাজাতে ভেতরে ঢুকে পড়ল। এই হয়েছে আজকাল আরেক সমস্যা, কারনে অকারনে ড্রাইভাররা গাড়ির হর্ন বাজাতে খুব পছন্দ করে। ফাঁকা রাস্তা? বাজাও হর্ন। রাস্তায় জ্যাম? বাজাও হর্ন। মালিকের উপর মাথা গরম? বাজাও হর্ন। ইচ্ছে হলেই হলো, উপায় আছে, বাজাও হর্ন। মাঝে মধ্যে রাস্তায় হাঁটার সময় হর্ন শুনলে ইচ্ছে হয় জুতা খুলে ড্রাইভারকে বেদম পেটাই। সেই সুযোগ আজ পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। মানুষ চাইলেই সব সময় সবকিছু করতে পারে না, এটাই সামাজিকতার সীমাবদ্ধতা।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই গাড়িটা গ্যারাজের দিকে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে, লক্ষ্য করলাম রাহাত মুখ লুকিয়ে দরজার পাশের বোতামটা টিপছে দরজাটা বন্ধ করতে। ড্রাইভার তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য করল বলে মনে হলো না। লাইব্রেরির জানালা থেকে গ্যারাজটাও ভাল করে দেখা যাচ্ছে, যদিও এটা রিহাকে আটকে রাখা

BanglaBook.org

ঘরটা থেকে দেখা যাচ্ছিল না। মালির ঘর আর দারোয়ানের জন্য তৈরি বিশেষ টয়লেটের মতো গাড়ি রাখার গ্যারেজটাও বাড়ির থেকে আলাদা করে বানানো। আমরা দীর্ঘদিন নজর রেখে দেখেছি, বারেক কালিয়ানের গাড়ি একাধিক। কিন্তু গ্যারাজটাও বিশাল বড়। মালির থাকার জন্য তৈরি বাড়িটাকে পাঁচবার জোড়া দিলে যে আকৃতির হবে, গ্যারাজটা হয়তো তার থেকেও কিছুটা বড়। এবং বলাই বাহুল্য, সেটাও খুব সুন্দর নকশা করে বানানো।

বাড়ির সামনের খোলা জায়গা আর বাগানের বুকে এক একটি স্থাপনা যেন বিস্তৃত সমুদ্রের বুকে এক একটি সবুজ বিত্তবান দ্বীপের মতোই সুন্দর মনে হল লাইব্রেরির জানালা থেকে।

ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে গ্যারাজের দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল। বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে রইলাম, কোথায় যেন হিসেবের গরমিল হচ্ছে। ড্রাইভার তো কখনো এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না, বরং গাড়ি দরজার সামনে এলেই দরজাটা আপনা আপনি উপরে উঠে যেতে শুরু করে! শুমেলের ধারনা এই ব্যাপারটা দরজার সামনে কিছু উপযুক্ত সেন্সর বসিয়ে করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু দরজা খুলছে না তার মানে একটাই, এই দরজার নিয়ন্ত্রন কোনও সেন্সর দিয়ে করা হয় না। সেটা নিয়ন্ত্রনের অন্য কোনও উপায় রয়েছে। কিন্তু উপায়টা কী?

এখানে রাহাতের জায়গাতে কাল্লু থাকলে চিন্তার কিছু ছিলনা। কিন্তু রাহাত যদি ড্রাইভারের সাথে ধস্তাধস্তিতে যায় তাহলে সেটার ফলাফল অনিশ্চিত। রাহাতকে এখন যেভাবেই হোক পরিকল্পনা অনুসরণ করে চলতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ি আগে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে গ্যারাজে ঢুকবে, তারপর নিতে হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা।

রাহাতও সম্ভবত ঘটনার গরমিলাটা এতক্ষণে ধরতে পেরেছ, দেখলাম ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে দরজার পাশের প্যানেলে কতগুলো বোতামকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বোতামগুলোর থেকে সঠিক বোতামটা খুঁজে বের করতে পারল না শেষ পর্যন্ত, তার আগেই ড্রাইভার দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে এল।

রাগে গজ গজ করতে করতে দরজার সামনে এসে ড্রাইভার বলল, "এইটা কী ধরনের ফাইজলামি? দরজা খোলো না কেন?"

রাহাত কিছু না বলে উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে রইল। রাহাতের শরীরের গঠনের সাথে দারোয়ানের শরীরের গঠনের অনেক মিল, তাই সহসা ছদ্মবেশে তাকে পেছন থেকে দেখে ভিন্ন মানুষ বলে ধারণা করা যায় না। কিন্তু কথা বলে ফেললেই সমস্যা হয়ে যাবে, কারণ দু'জনের কণ্ঠস্বর ভিন্ন। আর মানুষের গলা নকল করার মতো কোনও বিশেষ ক্ষমতাও রাহাতের নেই।

BanglaBook.org

ড্রাইভার রাহাতের আরও কাছে এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রেখে জোরে ঝাঁকি দিল, "কী মিয়া, কথা বল না ক্যান? দরজাও খোলো না, কথা বললে জবাবও দাও না, কী ঘটনা? ভালয় ভালয় দরজা খোলো বলতেছি, না হলে স্যার ফিরলে তোমার চাকরি নট করার ব্যবস্থা হবে।"

আমাকে অবাক করে রাহাত ঘুরে দাঁড়ালো ড্রাইভারের মুখোমুখি। ড্রাইভারও তার চেহারা দেখে চমকে উঠল। তোতলাতে তোতলাতে বলল, "এ-এ-একি! তু-তুমি কে?"

রাহাত ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমি তোর যম!"

রাহাতের হাতে উদ্ধত পিস্তল। কোথায় পেল ওটা! আমরা যে সাথে করে অস্ত্র নিয়ে আসিনি তা নয়, কিন্তু আমাদের একমাত্র বন্দুকটা তো রঞ্জনের কাছে থাকার কথা! কাল্লুর কাছেও একটা আছে, তবে সেটা আসল না। অযথা গোলাগুলি পছন্দ করে না দেখেই সবার হাতে বন্দুক দেবার যে আইডিয়াটা রাহাত দিয়েছিল, সেটা রঞ্জন বাতিল করেছিল। আর কাল্লুর হাতে খেলনা বন্দুক দেবার পেছনে যুক্তি দিয়ে ছিল, একটার থেকে দুটো বন্দুক হলে মানুষ ভয় বেশি পায়। যদি দরকার লাগে দুই একটা ফাঁকা গুলি যা করার সেটা রঞ্জনই করবে। কাল্লু শুধু বন্দুকটা উঁচিয়ে মাঝে মধ্যে ভয় দেখাবে। তবে কাল্লুর যা স্বাস্থ্য তাতে মানুষ এমনিতেই ভয় পেয়ে যায়, বন্দুক দেখানোর দরকার হয় না। কিন্তু রাহাত বন্দুক কোথায় পেল? তবে কি আসার আগেই একটা বন্দুক সবাইকে না জানিয়ে নিয়ে এসেছিল? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে কেন?!

ড্রাইভার চিৎকার দিতে চাইল, "বা-বাঁচাও..."

ড্রাইভারের পেটের উপর বন্দুকের নলটা শক্ত করে চেপে ধরল সে, চিৎকার শেষ হলো না।

রাহাত দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "চুপ শালা একটাও কথা বলবি না, বললে তোর ভুঁড়িতে তিনটা বড় বড় ফুটো করে দিব। গ্যারাজের দরজা খোলার বোতামটা চাপ দে।"

ড্রাইভারকে দরজার পাশের বোতাম প্যানেলটার দিকে ঠেলল রাহাত।

চুপ-চাপ একটা বোতাম টিপে দিল ড্রাইভার, আর সাথে সাথে গ্যারাজের দরজাটা উপরে উঠে যেতে শুরু করল। এবারে রাহাত ড্রাইভারকে গ্যারাজের সামনে রাখা গাড়িটার দিকে নিয়ে চলল। রাহাত হাতের পিস্তলটাকে এমনভাবে আড়াল করে ড্রাইভারের পেটের উপর ঠেসে ধরেছে যে উপর থেকে দেখে সেটার অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। ওর বাম হাত ড্রাইভারের কাঁধের উপর অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভঙ্গিতে রাখা।

BanglaBook.org

ভাবটা এমন যেন আনন্দের সাথে কাঁধে হাত রেখে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। ওদিকে ডানহাতে ধরা পিস্তলটা বন্দির ভুঁড়িতে সুরসুরি দিচ্ছে।

ওরা দু'জন গাড়ির কাছে চলে আসতেই হেডফোনে শুনতে পেলাম, রাহাত ড্রাইভারকে বলছে, "তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়। কোনও রকম চালাকির চেষ্টা করবি না। করলেই কিন্তু খতম।"

ড্রাইভার দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসল। বন্দুক হাতে রাহাতও ভেতরে ঢুকে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসল।

রাহাত সতর্ক করে দিলো, "গাড়ি উল্টো করে পার্ক করবি, একদম বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে, বুঝলি।"

ড্রাইভার অন্ধের মতো নির্দেশ পালন করে চলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা সামনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পার্ক করা হয়ে গেল। এই গাড়িটা আমাদের পরিকল্পনার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। ছবিগুলো বাড়ি থেকে নিচে নামানো শেষ হলে সেগুলোকে এনে এই গাড়ির মধ্যে ভরে ফেলব। তারপর এটাতে করে আমরা চলে যাব। তাতে পথচারীদের কারও কোনও সন্দেহ হবে না, সবাই ভাববে শিল্পীর বাসা থেকেই কেউ হয়তো বাইরে গিয়েছে। বারেক কালিয়ান বিদেশে গেছে এ কথা তো সবাই জানে না। শুধু সমস্যা হতে পারে যদি বাড়ির কেয়ারটেকাররা কেউ পুলিশে খবর দিয়ে দেয় তা হলে। তবে রঞ্জন সেটার ব্যবস্থাও ভেবে রেখেছিল। রাহাতের ব্যাগে নকল লাইসেন্স প্লেট আছে, হুবহু এই গাড়ির লাইসেন্স প্লেটটার আদলে তৈরি সেটা। যথা জায়গাতে ঘুষ দিয়ে সেটার নিবন্ধনও করিয়ে রাখা হয়েছে ঠিক একই মডেলের গাড়ির নামে। সুতরাং, পুলিশ যদি রাস্তায় ধরেও ফেলে তবুও আমাদের সন্দেহ করার কারণ খুঁজে পাবে না। আর কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেলেই গাড়িটাকে খুলে পার্টসগুলো বিক্রি করে দেবার পরিকল্পনা রয়েছে। দামি গাড়ি, শুধু শুধু নষ্ট করে তো লাভ নেই, তার থেকে এটার ভেতরের জিনিসগুলো বেচে দিলে পুলিশও কিছু বুঝবে না, আর আমাদের বাড়তি উপার্জন হবে। ক্ষতি কি! কালু একটা গ্যারেজে কথা বলে রেখেছে, গাড়ির পার্টস বিক্রিতে কোনও ঝামেলা হবে না।

যাক, মোটমুটিভাবে অনেক কিছুই আমাদের পরিকল্পনার বিপক্ষে গেলেও অন্তত পালাবার উপায়টা এখনও অক্ষত রয়েছে। রাহাতকে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হলো, হতভাগাটা একটা কাজের কাজ করেছে এতক্ষণে। এখন ভালয় ভালয় ড্রাইভারকে আটকে ফেলতে পারলেই অনেকটা নিশ্চিন্ত।

গাড়ি পার্ক করা হয়ে যেতেই প্রথমে রাহাত তারপরে ড্রাইভার গাড়ি থেকে

BanglaBook.org

বেরিয়ে এল। রাহাত ড্রাইভারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেটে থেকে একটা প্লাস্টিকের শিশি আর রুমাল বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলো। তারপর কড়া গলায় নির্দেশ দিলো, "এই শিশি থেকে ওই রুমালে পানিটা ঢালবি, তারপরে নিজের নাকের উপর শক্ত করে চেপে ধরে জোরে নিঃশ্বাস নিবি। কোনও রকম এদিক ওদিক করলে কিন্তু তোর খবর আছে। জানে মেরে ফেলব।"

ড্রাইভার ভীত কণ্ঠে জানতে চাইল, "এই শিশিতে কীসের পানি?"

"কীসের পানি তা তোর জানার দরকার নাই, যা বলছি সেইটা কর," ঝাড়ি দিলো রাহাত।

ড্রাইভার আর তর্ক না করে শিশির ঢাকনাটা খুলে ফেলল, তারপর ভেতরের প্রায় সবটুকু তরলই রুমালে ঢেলে দিলো। ধীর ধীরে নাকের কাছে রুমাল তুলে গন্ধ শোকার আগেই রুমালটা হাত ফস্কে গেল। রাহাত অধৈর্য হয়ে ড্রাইভারের আরও কাছে এসে পিস্তলের বাঁট দিয়ে ঘাড়ের উপর বাড়ি মারল, "উঠা হারামজাদা, দেরি করিস না, তোর খবর আছে!"

রাহাতকে চমকে দিয়ে ড্রাইভার দ্রুততার সাথে রুমালটা মাটি থেকে তুলে নিল, চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। রাহাত সামলে ওঠার আগেই প্রচণ্ড ধাক্কায় হাতের বন্দুকটা ছিটকে গাড়ির নিচে চলে গেল। শক্তহাতে রুমালটা ওর নাকে চেপে ধরল ড্রাইভার। রাহাত নিজেকে ছাড়ানর চেষ্টায় হাত পা দিয়ে দুম দাম তাকে আঘাত করার চেষ্টা করলো, কিন্তু রুমালে নাক আর চোখে ঢেকে থাকায় একটা ঘুসিও ঠিক জায়গা মতো পড়ল না। ক্রমশ ওর শরীরটা নিস্তেজ হয়ে এল।

ড্রাইভার আরও কিছুক্ষণ রুমালটা রাহাতের নাকে চেপে ধরে রইল কোনও ঝুঁকি না নিয়ে। এর পরে সে নিশ্চিত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিতেই রাহাতের ক্লান্ত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ক্লোরোফর্মের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে গেল রাহাত।

লাইব্রেরির নিঃসঙ্গ ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, সমস্যা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। এর থেকে কি আদৌ উদ্ধার পাওয়া সম্ভব? ফ্যালফ্যাল করে জানালা দিয়ে গ্যারেজের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

BanglaBook.org

৯

সময়: সন্ধ্যা ০৬:০০

এখনও জানালা দিয়ে ড্রাইভারের কীর্তিকলাপ দেখছি। এখান থেকে পালানোর ব্যাপারে একটা বড় রকমের সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরিকল্পনা মোতাবেক ড্রাইভারের চাবি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বেঁধে ফেলার কথা ছিল। রাহাত সেটা করতে পারেনি। চাবি ছাড়া গাড়ি নিয়ে পালানো সম্ভব না। যদিও বিদেশী সিনেমাতে মাঝে মধ্যে দেখা যায় গাড়ির তার কেটে কী সব শর্ট-সার্কিট করে নায়কেরা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ফেলে, কিন্তু আমাদের দলে সে রকম হিরো নেই। এরকম হবে আগে জানলে হয়তোবা এই পদ্ধতি শেখার চেষ্টা করা যেত!

কাল্লুর শব্দও এখন আর হেডফোনে শোনা যাচ্ছে না, মনে হয় ধস্তাধস্তির শব্দ আর রাহাতের নিরবতা শুনে সেও বুঝতে পেরেছে ঘটনা ভালর দিকে যায়নি। কাল্লুও চুপ হয়ে যাওয়ায় নিজেকে অনেক একা মনে হলো। একাকীত্ব মানুষের অন্যতম দুর্বলতা। আমার বাবা সবসময় বলতেন, "একা আর বোকা সমান।"

কথাটার গুরুত্ব এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। রিহাকে বন্দি বানিয়ে যেটুকু সাহস যুগিয়েছিলাম তার সবটাই উবে গিয়ে সেখানে সমপরিমাণের হতাশা এসে ভর করেছে।

ড্রাইভার প্রথমেই গাড়ির পেছনে গিয়ে ডিকিটা খুলে এক গোছা দড়ি বের করল। সাবধানে সেটা দিয়ে রাহাতকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। যদিও যে পরিমানে ক্লোরোফর্ম রাহাত শুঁকেছে তাতে আট দশ ঘন্টার আগে তার জ্ঞান আসবে বলে মনে হয় না। তবে ড্রাইভার যে খুব সাবধানি লোক সেটা বোঝা গেল। রাহাতকে বাঁধা শেষ হতেই ড্রাইভার গ্যারাজের বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই ড্রাইভার প্যান্টের পকেট থেকে একটা মোবাইল তুলে কাকে যেন কল করল। বিষয়টা যথেষ্ট উদ্বেগের। ড্রাইভার যদি এখন পুলিশকে ফোন করে থাকে তা হলে আমাদের আর এখান থেকে বেঁচে ফিরতে হবে না। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে নির্ঘাত জেলের ঘানি। আর বারেক কালিয়ান যে পরিমানে প্রতাপশালি লোক, তাতে সেই ঘানি টানার সময়কাল কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাত বছরের কম হবে না। আর যদি কোনওভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কেসটাকে অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডারে নিয়ে ফেলতে পারে তা হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হয়ে যেতে পারে।

BanglaBook.org

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখে চললাম।

কথা শেষ হতেই ড্রাইভার ফোনটা পকেটে ভরে ফেলল, এবং কোমর থেকে পিস্তলটা হাতে তুলে সাবধানে বাড়ির দরজাতে গিয়ে বেল টিপল। রাহাতের হাতের পিস্তলটা গ্যারাজ থেকে বের হবার আগে সে গাড়ির নিচ থেকে নিয়ে নিয়েছিল। বর্তমানে ওটাই তার হাতে শোভা পাচ্ছে।

আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে দরজাটা খুলে গেল। এভাবে একটা পিস্তল হাতে ধরে থাকা লোকের সামনে বিনা বাঁধায় দরজা খুলে যাওয়ার একটাই মানে থাকতে পারে, তা সে যতোই পরিচিত ড্রাইভার হোক না কেন। নির্ঘাত এই ড্রাইভারও রিহার সঙ্গি।

সহসাই সবকিছু পানির মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলাম, ড্রাইভারের ভেতরে ঢোকা থেকে রাহাতের কাছে আসা, ভয় পাওয়া, পুরোটাই অভিনয় ছিল। নিশ্চয়ই এই বাড়ির থেকে কেউ ফোন করে ওকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল। রঞ্জন কিংবা শুমেলের হেডফোনে রাহাত আর কাল্লুর আলাপচারিতা শুনে ওরা বুঝে ফেলেছিল আমরা কী করতে চলেছি। সাথে সাথে সতর্ক হয়ে গেছে।

ক্রমশই শত্রু বেড়ে চলছে! তাদের প্রস্তুতির ব্যাপারে আন্দাজ করাও এখন অনেকটাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

লাইব্রেরির এই ঘরটা এখন আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না। যদিও কেউ জানে না আমি এখানে আছি, কিন্তু জানতে কতক্ষণ? রিহার সঙ্গিরা জানে, আমি তিন তলাতে আছি। তাছাড়া রিহা এতক্ষণে ফিরে না যাওয়াতে তাদের অবশ্যই সন্দেহ হয়েছে। সুতরাং, বিপদ খুব দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

ব্যাগটা আড়াআড়িভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ছবি চুরির কথা পরে ভাবলেও হবে, আগে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া দরকার। বেরিয়ে আসার সাথে সাথে যথারীতি ঘরের দরজাটা চাবি দিয়ে লক করে দিলাম।

আবার সামনে এগিয়ে চললাম। করিডোরটা বড্ড নীরব। লক্ষণ খুব একটা ভাল নয়। যেন সমুদ্রে ঝড়ের পূর্বাভাষ।

হাঁটার গতি বাড়ালাম। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর একটা ঘরের সামনে এসে থমকে যেতে হলো। ভেতর থেকে চাপা গোঙানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেব কি দেব না এটা নিয়ে নিজের সাথেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গেলাম। আরও কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর শেষ পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে ঘটনাটা যাচাই করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। এটা রঞ্জন কিংবা শুমেলের আওয়াজ হলে খুব ভালো হয়। কিংবা, কাল্লু হলেও চলবে। কাল্লু পাশে থাকলে বাড়তি ভরসা মেলে।

BanglaBook.org

দরজাটার হাতল ধরে মোচড় দিতেই বুঝলাম চাবি ছাড়া ঢোকা যাবে না। চাবির গোছা থেকে একের পর এক চাবি দিয়ে দরজাটা খোলার চেষ্টা করে চললাম। ঠিক বারো নম্বর চাবিটা ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই দরজাটা খুলে গেল। এদিক ওদিক সাবধানে দেখে ঘরের ভেতর ঢুকলাম।

ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, কারণ ঘরে কোনও জানালা নেই। আমি আর ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার উপস্থিতি খুঁজে দেখার চেষ্টা করলাম না। একটু একটু করে এগিয়ে চললাম বাড়তে থাকা গোঙানির শব্দটার দিকে। শব্দটার একদম কাছে চলে আসতেই বুঝলাম, ওটা রঞ্জন, শুমেল কিংবা কাল্লুর কণ্ঠস্বর নয়, বরং একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

আবাছাভাবে দেখতে পেলাম এক বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে, বিশালাকার সোফার সাথে আটকে রাখা হয়েছে। ঘাড়ের উপর থাকা একগাদা ঝামেলার উপর আরও একটা উটকো ঝামেলা চাপাতে ইচ্ছে করছিল না। কী করব! চোর হতে পারি, কিন্তু নিজের বিবেকটাকে তো এখনও গলা টিপে মেরে ফেলতে পারিনি! মহিলার কাছে গিয়ে তার মুখে বেঁধে রাখা কাপড়টা সরিয়ে দিলাম।

হড়বড় করে অনেক কিছু বলতে চাইলেন তিনি, আমি দ্রুত তার মুখটা চেপে ধরলাম। ফিস ফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, "জোরে কথা বলবেন না, দেয়ালেরও কান আছে। আপনি আগে শান্ত হোন। আমার কথা বুঝতে পারলে ডান থেকে বামে মাথা নাড়ান।"

আমার কথা শুনে মহিলা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলেন। তারপরে নিজের মাথাটা ডান থেকে বাম দিকে নাড়ালেন তিন বার। আমি তার মুখের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিলাম।

মহিলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তু...তুমি কে?"

ভদ্রমহিলার প্রশ্নে বিপদে পড়ে গেলাম। কী বলি এখন ওনাকে? যদি বলি চোর, তাহলে তো ঝামেলা। আর যদি বলি টেলিফোনের লাইনম্যান তাহলেও হাজারটা প্রশ্ন করবে।

মহিলা আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বললেন, "কী ব্যাপার, বলছ না যে, কে তুমি?"

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "আমি কে সেটা পরে হবে, আগে বলেন আপনি কে?"

মহিলা হাত-পা বাঁধা অসহায় অবস্থায় বুঝতে পারলেন আমি আপাতত তার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছি না, তিনি অগত্যা আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন, "আমি

BanglaBook.org

বারেকের মা।"

মনে হলো দশ তলা দালানের উপর থেকে কেউ আমাকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়েছে। বারেক কালিয়ানের মা! সে আবার কোথা থেকে এল! দীর্ঘ আট মাস এই বাড়ির উপর দিন রাত নজর রেখেছি কেউ না কেউ, অথচ একবারের জন্যও এই মহিলার দেখা পাইনি, এটা কীভাবে সম্ভব?

থতমত খেয়ে বললাম, "বারেক! কোন বারেক? বারেক কালিয়ান??"

মহিলা উপর নিচে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। "কি...কিন্তু...এটা কী...কী করে সম্ভব?"

মহিলা বিরক্তির হলেন, "কী করে সম্ভব মানে? বারেকের মা থাকার ব্যাপারটাতে তুমি এত অবাক হচ্ছো কেন! সমস্যাটা কী তোমার?"

সামাল দেওয়ার মতো করে বললাম, "না মানে আপনাকে তো কখনো বাড়ির বাইরে কেউ দেখেনি..."

ভদ্রমহিলা বিমর্ষ হয়ে গেলেন। আমাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে নিজেই ব্যাখ্যা করলেন। "আমি বাড়ির বাইরে যাই না, কেউ আমাকে নিয়েও যায় না। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, ডাক্তার বলেছে অসুস্থ শরীর নিয়ে বাইরে বেশি ঘোরা ফেরা করা উচিৎ না। তাই যেতে দেয় না। কিন্তু আমার খুব বাইরে যেতে ইচ্ছে হয়, জানো?!"

মহিলার গুমরে যাওয়া ভাব দেখে দুঃখ পেলাম। মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে এমনটাই হয়। হয়তো তাদের ভালোর জন্যই তাদেরকে অনেক সময় অনেক আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। তারা সেটা বোঝে, কিন্তু মেনে নিতে পারে না। আনন্দ পেতে কে না চায়? মানুষের জীবন থেকে আনন্দ সরে গেলে বেঁচে থাকা অনেক বেশি দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। জীবনটা তখন কারাগারের বন্দি দশার মতো লাগে। তখন অনেকে বেঁচে থাকার থেকে মৃত্যুর মুক্তিকেও শ্রেয় বলে মনে করে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "সেটা বুঝলাম, কিন্তু আপনাকে এভাবে আটকে রাখল কে?" জানতে চাইলাম।

মহিলা ঠোঁট উল্টে বললেন, "কে জানে! রিহা এসে সকালের নাস্তা দিয়ে গেল। খেতেই কেমন একটা ঘুম ঘুম ভাব এল। বিছানাতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু আগেই ঘুম ভেঙেছে, দেখি, এই সোফার মধ্যে বাঁধা পড়ে আছি।"

বুঝলাম, রঞ্জন আর শুমেলের মতো এই ভদ্রমহিলার খাবারেও ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল রিহা। মেয়েটাকে দেখে যতটা ভাল মনে হয় ও আসলে ততটাই শয়তান। ইচ্ছে হলো ওকে গিয়ে এখনই একটা চড় মেরে আসি। যাই হোক, মাথা

BanglaBook.org

গরম করে কাজ নেই, এখন বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। যদিও এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি, এই মহিলাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে কিনা। দেখি, পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে হয়তো ছেড়েও দিতে পারি।

ভদ্রমহিলা আমাকে চুপচাপ থাকতে দেখে বললেন, "বাবা, আমি কে সেটা তো বললাম, কিন্তু তুমি কে সেটা বুঝতে পারছি না।"

অগত্যা মিথ্যা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। কাটাকাটাভাবে বললাম, "আমি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে এসেছি। আপনার ছেলে আমাদের রির্পোট করেছিল বাড়িতে একটা চুরি হতে পারে। তাই তদন্ত করে দেখতে এসেছি সন্দেহের কতটা সত্যি।"

"আজ তো বারেক নেই, আজ কেন এলে?" প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আমাকে আপাদমস্তক মাপলেন উনি।

"জেনেশুনেই এসেছি। উনি না থাকলেই তো চুরির সুবিধে, তাই না?" পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম।

"হুম," একমত হলেন উনি, তারপর গম্ভিরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তদন্ত করে কিছু পেলে?"

"পেয়েছি তো বটেই, এই যে আপনাকে পেলাম," বললাম আমি।

ভদ্রমহিলা আগ্রহি হয়ে বললেন, "সে-তো বুঝলাম, কিন্তু আর কিছু?"

ছোট্ট কাশি দিয়ে বললাম, "আর কী! নিজের আবছা দেখে বুঝছেন না? শিল্পীর ধারনা সত্য, আপানাদের বাড়ির কেয়ারটেকার রিহ্য আর ড্রাইভার চুরির চক্রান্তের সাথে জড়িত। তবে আমার ধারণা ওদের সাথে কেয়ারটেকার ফিরোজও আছে।"

এবারে ভদ্রমহিলা চোখ উল্টালেন "ফিরোজও? কিন্তু সে তো অনেকদিন ধরে বাড়িতে কাজ করছে! তা প্রায় দশ বছর তো হবেই। ওর বিরুদ্ধে তোমার কাছে কোন প্রমাণ আছে?"

গুরুত্বপূর্ণ ভাব দেখিয়ে বললাম, "প্রমাণ কিছু আছে বটে, কিন্তু সেটা আপাতত তদন্তের স্বার্থে কারও সাথে আলোচনা করা যাবে না।"

কথা শুনে ভদ্রমহিলা বুঝলেন এটা নিয়ে গভির আলোচনাতে যেতে চাচ্ছি না। সুতরাং উনিও বাড়তি চাপ দিলেন না বেশি কিছু বলতে।

এবারে মাথাতে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে থাকা প্রশ্নটা করে ফেললাম তাকে, "আচ্ছা আপনার সাথে কি মোবাইল ফোন আছে?"

ভদ্রমহিলা বিভ্রান্ত হয়ে উত্তর দিলেন, "হাতে তো নেই, মনে হয় বিছানার ওদিকটাতে আছে সেলফোনটা।"

ওনার কথা শুনে বিছানার কাছে গেলাম। চারপাশটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম।

BanglaBook.org

এই মহিলার কোন মোবাইল থাকলে সেটা তার হাতে যাতে না পড়ে সেই ব্যবস্থা আগে ভাগে করে ফেলা দরকার। উনি ভয় পেয়ে পুলিশকে ফোন করলে বারোটা বেজে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পরেও আমি মোবাইলটা পেলাম না। হতাশা নিয়ে মহিলার দিকে তাকাতেই তিনি দুর্বলভাবে বললেন, "মনে হয় আমাকে অজ্ঞান করে ওটা রিহা নিয়ে গেছে।"

হুম, কথাটা ভেবে দেখার মতো, তবে রিহা নিলে সমস্যা নেই। আমিও চোর, রিহাও চোর, সুতরাং সে কিংবা তার দলের কেউ অন্ততপক্ষে পুলিশকে খবর দেবে না এটা নিশ্চিত।

অপ্রস্তুত হাসলাম। বললাম, "হবে হয়তো।"

এবারে তাড়া দিলেন ভদ্রমহিলা, "তা হলে বাবা, আমার বাঁধনগুলো খুলে দাও। কতক্ষণ এরকম বাঁধা রয়েছি কে জানে! হাত-পা বড্ড ব্যথা করছে।"

হাত-পা ব্যথা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এতক্ষণ হাত পা বাঁধা অবস্থায় বিছানাতে শুয়ে থাকলেও যে কোন সুস্থ মানুষের হাত পা ব্যথা হয়ে যাওয়ার কথা। আর উনি তো একজন অসুস্থ বয়স্ক মহিলা। সমস্যা হচ্ছে, ওনাকে এখন ছেড়ে দিলে যদি উনি বাইরে চলে যান তাহলে আমি উল্টো ফেঁসে যাব। আমার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে রিহার দলের নির্দিষ্ট ধারণা হয়ে যাবে, তখন আমাকে তারা খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারবে। আবার মহিলাকে না ছাড়লেও সমস্যা। উনি বিভ্রান্ত হয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করতে পারেন, তখনও ফিরোজরা বুঝে যাবে আমি কোথায় রয়েছি। কী করব সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না সঠিক।

আমাকে আবারও চুপ হয়ে যেতে দেখে ভদ্রমহিলা তাড়া দিলেন, "কী বাবা, খুলে দাও, বড্ড লাগছে যে!"

অবশেষে কঠোরভাবে বললাম, "আপনাকে খুলে দিতে পারি, তবে একটা শর্ত আছে।"

উনি ভ্রুকুটি করলেন, "কী শর্ত?"

"আপনি এই ঘরের বাইরে যেতে পারবেন না। কোন শব্দও করতে পারবেন না ভেতরে বসে," সরাসরি বললাম।

প্রস্তাব শুনে বিরক্ত হলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, কেন, আমার বাড়িতে আমি বাইরে যেতে পারবো না কেন? তাতে কী সমস্যা?

বোঝানোর চেষ্টা করলাম, "আহা, বুঝতে পারছেন না কেন? বাইরে সমূহ বিপদ। ওরা কয়েকজন রয়েছে, তার উপর আবার ওদের সাথে অস্ত্রও আছে। যে

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

কোনও সময় একটা গোলাগুলির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, তখন আপনি বিপদে পড়ে যাবেন। তাছাড়া, আমার সাথে আরও যারা এসেছিল তাদের মধ্যে তিনজন এখন ওদের হাতে বন্দি, সুতরাং আমার আগে ওদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আপনার দিকে বেশি একটা লক্ষ্য রাখতে পারব না। আপনি বৃদ্ধ মানুষ, কোনও রকম বিপদ হলে এই অসুস্থ শরীরে সেটার ধকল সইতে পারবেন না। তাই আপনি এই ঘরে চুপচাপ বসে থাকলেই ভাল। এতে ওরা ধরে নেবে যে এখনও অজ্ঞান হয়েই আছেন, তাই আপনাকে আর ঘাটাতে আসবে না কেউ। আমি ওদিকটা সামলে তারপর এসে আপনাকে উদ্ধার করব।"

ভদ্রমহিলা বড় বড় চোখ করে বললেন, "ওদের সাথে অস্ত্রও আছে?"

"আছে তো," চট পট জবাব দিলাম।

"কিন্তু, অস্ত্র কোথায় পেল?" ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

হতাশভাবে জানালাম, "আমার সঙ্গিদের থেকেই হাতিয়ে নিয়েছে।"

আমার হতাশ ভাবটা দেখে ভদ্রমহিলা ছোট্ট করে বললেন, "ও।"

এবারে তাড়া দিলাম, "বলুন, শর্তে রাজি আছেন?"

উনি সম্মতি দিয়ে উপর-নিচে মাথা নাড়ালেন। দ্রুত হাতে বাঁধন খুলে চললাম। ঘরের ভেতর অযথাই অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে, এতক্ষণে কাল্লু কতদূর করল কে জানে! ধরা না পড়লেই হয়। রঞ্জন আর শুমেল কোথায় সেটাও অজনা! ওদেরকে উদ্ধার না করে পালানো যাবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভদ্রমহিলার হাতের বাঁধন আলগা হয়ে এল। বাকি বাঁধনটা ওনাকেই খুলে ফেলতে বলে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলাম।

১০

সময় : সন্ধ্যা ০৬:৩৮

বারেক কালিয়ানের মায়ের সাথে বকর বকর করতে গিয়ে পাক্কা আধা ঘন্টা নষ্ট হয়েছে। কাজটা না করলেও হত, ওই মহিলা ওখানে আটকা থাকলে কিছু যেত আসত না। তবে এই কাজটা করে নৈতিকভাবে শান্তি পেয়েছি। যদিও ওনাকে পুরোপুরি মুক্ত করে দিয়েছি বলা ঠিক হবে না; আসলে তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছি।

বাইরে বের হয়ে দরজাটা লক করে চাবিটা চাবির ফুটোতেই ভেঙে রেখে দিয়েছি, যাতে ভেতর কিংবা বাইরে থেকে কেউ সহজে দরজা খুলতে না পারে। মহিলাকে দেখে মনে হয়নি সে কথার বরখেলাপ করে বাইরে হাওয়া খেতে আসবে; তবে ঝুঁকি নেওয়া উচিৎ হত না। তারচে এই ব্যবস্থাই ভাল; উনিও সুরক্ষিত থাকবেন, আর আমিও নিশ্চিন্ত থাকব। উনি রাগলে রাগুন, কিচ্ছু করার নেই।

ঘোরানো করিডোর ধরে আবারও সামনে পা বাড়াতেই শুনতে পেলাম দ্রুত গতিতে একটা পায়ের শব্দ এদিকেই এগিয়ে আসছে। জলদি সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করলাম। মাঝে মধ্যে এমন হয়, প্রয়োজনের সময় কোনও বুদ্ধি মাথাতে আসে না। কিন্তু আমার মাথায় চট করে একটা দারুন বুদ্ধি চলে এল। জুতোটা খুলে হাতে নিলাম, তারপর ঝেড়ে দৌড় লাগালাম উল্টো পথে।

জুতো খুলে ফেলায় দৌড়ের কোনও শব্দই হচ্ছিল না। যেতে যেতেই লক্ষ্য করলাম রিহাকে যে ঘরে আটকে রেখে এসেছি সেই ঘরের দরজাটা খোলা। বুঝলাম, ওরা এসে রিহাকে মুক্ত করেছে। এখন মনে হচ্ছে এই ঘরের দরজার সাথেও চাবিটা ভেঙে রেখে যাওয়া উচিৎ ছিল। তখন মাথায় বুদ্ধিটা কেন আসেনি কে জানে!

দরজার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে জল্পনা কল্পনা করার মতো সময় নেই, তাই অতীতের ভুলটাকে মুহূর্তেই ক্ষমা করে দিলাম। দৌড়ে চললাম সেই সিঁড়ির দিকে যেটা দিয়ে রিহার সঙ্গে তিন তলাতে উঠেছিলাম। যত দ্রুত সম্ভব নিচে নেমে যেতে হবে, এই তলাতে আর থাকা যাবে না। দেরি হলেই বিপদ, ওরা আমাকেও ধরে ফেলবে।

সিঁড়ির দরজা খোলাই ছিল, আমি যতটা নিঃশব্দে সম্ভব দরজাটাকে চেপে লাগিয়ে দিলাম। অতঃপর খালি পায়েই নিচে নামতে শুরু করলাম। সিঁড়ি ঘরে আলো জ্বলছিল, তাই ধাপগুলোতে পা ফেলে নিচে নামতে তেমন অসুবিধা হলো না। বেশ

BanglaBook.org

কিছুটা নামার পর জুতোটা পরে নিলাম। খালি পায়ে অসহ্য লাগছিল।

অবশেষে দোতলায় ঢোকার দরজাটার সামনে পৌঁছলাম। খুব সাবধানে হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। আবার পা রাখলাম সেই পরিচিত করিডোরে। সন্ধ্যার নিষ্প্রভ আলোয় পুরো জায়গাটা রহস্যময় হয়ে পড়েছে। সেই রহস্যময়তায় দাঁড়িয়ে মাথার ভেতর নানান চিন্তা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে কেবলই। শুধু জানি, রাহাত কোথায় বন্দি; কিন্তু, শুমেল, রঞ্জন, কাল্লু এরা কে কোথায় তার কিছুই জানি না! কোথায় খুঁজব ওদের? তার উপরে রিহার দলটা কোন কোন ঘরের উপর নজর রাখছে ক্যামেরা দিয়ে সেটাও আগে থেকে আন্দাজ করা সম্ভব নয়! পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে ড্রাইভারের হাতে চলে যাওয়া রাহাতের বন্দুকটা! গবেটটা অস্ত্র আনতে গেল কেন কে জানে! এখন সরাসরি ড্রাইভারের সামনে পড়লে সবথেকে বড় ঝামেলা হয়ে যাবে। সবদিক ভেবে বারেক কালিয়ানের ঘরের দিকেই ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। হয়তো ওখানেই কোনও সূত্র মিলবে।

হেঁটে চললাম, শিল্পীর সেই ঘরটার দিকে, যেখানে রঞ্জন আর শুমেল ছিল কেবল মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। এমন তো হতেই পারে, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে রঞ্জন পরিস্থিতি বুঝতে পেরে কোনও নির্দেশ রেখে গিয়েছে! যদিও কাল্লু সেই ঘর থেকে একবার ঘুরে কিছুই পায়নি, কিন্তু ওর বুদ্ধির উপর আমার খুব আস্থা আছে বললে মিথ্যা বলা হবে। তার থেকে নিজেই একবার খুঁজে দেখি কিছু পাই কি না।

আগেই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে ঘরে ক্যামেরা নেই, তাই ওটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। তবে, ঘরে ঢোকার আগে একবার দরজায় কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম ভেতরে কারও কথা বলা, কিংবা হাঁটা-চলার শব্দ পাওয়া যায় কি না। সেখানে কেউ নেই নিশ্চিত হবার পর ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

ঘরের জানালা দিয়ে পড়ন্ত বেলার যেটুকু আলো আছড়ে পড়ছে তাতে আবাছাভাবে মোটামুটি সবকিছুই এখনও দেখা যাচ্ছে। সেই আলোতেই সম্ভাব্য নির্দেশনার জন্য ঘরটির আনাচ কানাচ খুঁজে চললাম।

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ল, শিল্পীর যে কয়টি ছবি আমরা দেয়াল থেকে নামিয়ে বেঁধে রেখেছিলাম, সেগুলো ঘরের মধ্যে অনুপস্থিত। নিঃসন্দেহে রিহার কোনও সহকর্মিই ওসব সরানোর ব্যবস্থা করেছে। তার মানে দাঁড়ায়, ওদেরও ছবি চুরির পরিকল্পনা রয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, চুরিই যখন করবি তখন আরও ক'দিন আগে করলেই পারতি! একদম আমাদের সাথে একই দিনে চুরির প্ল্যান বানানোর কী দরকার ছিল? সবই দুর্ভাগ্য, না হলে এমন হয় নাকি!

ছবি নেই দেখেই আমার মনে এল টাকার কথা। দেখলাম জানালার ধার ঘেসে

BanglaBook.org

রঞ্জন আর শুমেলের ব্যাগ দুটো অনাদরে পড়ে আছে। দ্রুত হাতে ব্যাগ ঘাঁটতে শুরু করলাম। ভেতরটা দেখে মনে স্বস্তি ফিরে এল। যাক, এত বিপদের মধ্যেও ভাগ্য আমাদের উপর একদম বিশ্রীভাবে অপ্রসন্ন না, টাকাগুলো এখনও ওদের ব্যাগের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

তিনটে ব্যাগ নিয়ে একা চলাফেরা করা অসম্ভব, টাকাগুলো যে কোনও একটা ব্যাগে ভরে ফেলা দরকার। আমাদের তিন জনের মধ্যে রঞ্জনের ব্যাগটা সবথেকে বড়। আমার আর শুমেলের ব্যাগ থেকে যতটা সম্ভব টাকার বান্ডিল রঞ্জনের ব্যাগে চালান করলাম। যাক এবারে কিছুটা নিশ্চিত, ছবি না নিয়ে পালিয়ে গেলেও পরিকল্পনা একদম বৃথা ছিল বলা যাবে না। আমার ব্যাগটাকে রঞ্জনের ব্যাগটার জায়গাতে শুইয়ে রেখে আমি ওর ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিলাম।

আবার আশেপাশে খুঁজে দেখলাম নির্দেশনার জন্য। এভাবে প্রায় মিনিট বিশেক পেরিয়ে যাবার পরেও কিছুই খুঁজে পেলাম না। হতাশ হয়ে ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম অতঃপর। সারাদিনের দৌড় ঝাঁপে বড্ড ক্লান্ত লাগছে, শরীর আর সায় দিতে চাইছে না।

ক্লান্তভাবে আমার ঘুরতে থাকা চোখ দুটি গিয়ে পড়ল ঘরের সুন্দর কারুকাজ করা আলমারি দুটোর উপর। ঠিক করলাম এই ঘর থেকে বের হবার আগে একবার আলমারির ভেতরটাও পরীক্ষা করে দেখবে। সেখানে কী আছে। লোভ জিনিসটাই এমন, যখন কাউকে গ্রাস করে ফেলে তখন সে যতই চেষ্টা করুক নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। ঘুরে ফিরে বার বার প্রলুব্ধ হয়। আমিও লোভের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

আগেই বলেছি ম্যানুয়াল লক খোলার ব্যাপারে আমি সিদ্ধহস্ত, সুতরাং আলমারির কাঠের দরজা দুটো বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারল না। খুব সহজেই দুটি সেফটিপিনকে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে চলনসই লকপিক তৈরি করে ফেললাম। সেটা দিয়ে আলমারির লকে কিছুক্ষণ কেরামতি করতেই প্রথম আলমারির দরজাটা খুলে এল।

ভেতরে চোখ রাখলাম।

আলমারির ভেতরটা বেশ গভির। এক পাশে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত খাঁড়া একটা কম্পার্টমেন্ট। সেটা পাশে পুরো আলমারির অর্ধেকটা সমান চওড়া। সেখানে অনেকগুলো বড় বড় কোট হ্যাঙ্গার দিয়ে ঝুলান। অপর পাশে পাঁচটার মতো তাক দিয়ে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সমান ভাগে ভাগ করা। সেখানে ছড়ানো ছিটানো কিছু প্যান্ট-গেঞ্জি ভাঁজ করে রাখা আছে।

BanglaBook.org

আলমারির ভেতর মূল্যবান কিছুই খুঁজে পেলাম না। জানি, বড় বড় ধনীরা আলমারিতে অনেক সময় গহনা আর মূল্যবান দলিলপত্র লুকিয়ে রাখেন, কিন্তু এরা মনে হচ্ছে কিছুই রাখে না। আমারই ভুল হয়েছে, সে রকম মূল্যবান কিছু হলে সেটা শিল্পী অবশ্যই সিন্দুকের ভেতরেই রাখতো। শুধু শুধু আলমারি খুলে সময় নষ্ট করলাম। দ্বিতীয় আলমারিটা খুলে দেখার কোনও আগ্রহ পেলাম না।

আলমারির হাট হয়ে খুলে থাকা দরজাটা ভেজিয়ে টাকাভর্তি ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিলাম। বাইরে পায়ের শব্দ পেলাম। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপচাপ ঘরে বসে রইলাম। শব্দটা দরজার সামনে এসে থেমে গেল, বুঝলাম এখনই কেউ ঘরে ঢুকবে। অতি সাবধানে ভেজিয়ে রাখা দরজাটা খুলে নিঃশব্দে আলমারির কোট ঝোলান জায়গাটাতে বসে পড়লাম। আস্তে করে আলমারির দরজাটা ভেতর থেকে টেনে দিলাম।

বারেক কালিয়ানের ঘরের দরজাটা দুম করে খুলে গেল। সেখানে থেকে দুটি পায়ের শব্দ ভেতরে চলে এল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখলাম ঘরে আলো জ্বলে উঠল। আলোর এক চিলতে আলমারির ভেতর হানা দিলো। আচমকা আলোয় চোখে ধাঁধা দেখলাম। কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

চোখ বোজা অবস্থাতেই কান খাড়া করে শুনলাম দুজন লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলছে :

"ফিরোজ ভাই, ওই ব্যাটা গেল কই বলেন দেখি?"

অপরজন বলল, "জলিল, এত টেনশন নিচ্ছ কেন? ওকে ঠিক পেয়ে যাব।"

এবারে জলিল নামের লোকটা কণ্ঠে বিস্ময় নিয়ে বলল, "কিন্তু ভাই ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখছেন, শয়তানটা কীভাবে রিহাকে অজ্ঞান করে আটকে রেখেছিল? ডেঞ্জারাস লোক!"

জবাবে ফিরোজ কিছু বলল না।

কিন্তু জলিল বলে চলল, "আবার ফাজিলটা গায়ের উপর কাপড় ফেলে গেছে। আহা কি দরদ! মনে হয় যেন বিয়ে করা বউ।"

এবারেও ফিরোজ কোনও কথা বলল না, শুধুমাত্র ঘরময় পায়চারি করে চলল।

জলিল অভিমানি হয়ে বলল, "তবে ফিরোজ ভাই, যাই বলেন, রিহাকে কিন্তু দারুন লাগছিল দেখতে। আপনি একাই ওকে কোলে করে নিয়ে গেলেন, আমাকেও একটু সুযোগ দিলে পারতেন!"

এই কথায় ফিরোজ ঝাড়ি মেরে উঠল, "এসব বাজে কথা রাখো তো! কাজের কথা থাকলে বল।"

"আহা ভাই রাগ করেন কেন? আমি তো বলি নাই যে আপনি মজা লুটছেন।

BanglaBook.org

মজা তো লুটছে ওই শালা। আপনি তো যা করেছেন ভাল ভেবেই করেছেন, শুধু..."

ফিরোজ আগের থেকেও জোরে চিৎকার দিলো, "আহ! তুমি থামবে? যতসব বাজে কথা বলছ তখন থেকে।" তারপর গলা নামিয়ে গজগজ করে বলল, "ওই বেজন্মা একবার হাতে আসুক, তারপর দ্যাখো কী করি।"

আস্তে আস্তে চোখ মেললাম, বাইরের আলোটা এখন আর অতটা সমস্যা করছে না। আলমারির ফাঁকা দিয়ে বাইরে চোখ রাখলাম, কী হচ্ছে দেখতে। প্রথমটায় কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না, তবে কথা বলতে বলতে দুজনেই আমার দৃষ্টির সীমানার চলে এল। দেখতে পেলাম সেই ড্রাইভার, যাকে আমি তিনতলা থেকে দেখেছিলাম, ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সাথে আরও একজন অচেনা লোক। লোকটা আমার থেকে কমপক্ষে চার ইঞ্চি বেশি লম্বা হবে, বয়স বোধ করি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি। কাঁচা পাকা চুল, ঘন ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। চোখে রিমলেস চশমা পরা। প্রথম দেখাতেই যে কেউ একে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ বলে ধরে নেবে। বুঝে গেলাম এটাই ফিরোজ। চুপ চাপ ওদের পরবর্তি কথাগুলো মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করলাম।

জলিল হতাশভাবে বলল, "হারামজাদা চালাক আছে, যেভাবে সেভাবে করে বার বার পিছলে যাচ্ছে হাতের মুঠো থেকে।"

এই কথা শুনে ফিরোজ সন্দেহের চোখে জলিলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, "তুমি ঠিক শুনেছিলে? ও তিন তালাতেই ছিল?"

আমতা আমতা করল জলিল। "আমি একা কেন! আপনিও না শুনলেন ভাই। তারপরেই তো পায়ের শব্দটা গায়েব হয়ে গেল!!"

ফিরোজ মাথা চুলকাল। "হুম সেটাই, আমিও তো স্পষ্ট শুনলাম বলে মনে হলো। ব্যাটা গেল কই?!"

এবারে জলিল গুরুত্বের সঙ্গে বলল, "যা-ই বলেন ফিরোজ ভাই, আমাদের কিন্তু পুরা তিন তলাটা খুঁজে দেখা দরকার ছিল!"

"তোমার বুদ্ধি কি দিন দিন কমে নাকি? তিন তালাটা কত বড় জানো? পুরো খুঁজে দেখার সময় কই?" জলিলকে তিরস্কার করল ফিরোজ।

ফিরোজের তিরস্কার মেনে নিয়ে জলিল বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল। তারপর চারপাশটা দেখে বলল, "ফিরোজ ভাই, বাড়িখান কিন্তু জবর, আর ঘরগুলোও স্যার যে ভাবে সাজিয়েছেন, কোনও তুলনা নাই। পাঁচ বছর হয়ে গেল এখানে কাজ করি, আজই প্রথম উপরে ওঠার সুযোগ হলো, ভাগ্যিস আপনার সাথে কাজটা করতে রাজি হয়েছিলাম।"

ফিরোজ তির্যক হাসি দিলো। "তুমি তো রাজিই হতে চাচ্ছিলে না, পরে রিহা

BanglaBook.org

বলতেই একদম নাচতে নাচতে রাজি হয়ে গেলে! তোমাদের আসলে স্বভাবটাই খারাপ, মেয়ে মানুষ একটু হেসে কিছু বললেই হয়ে গেল, একদম বরফের মতো গলে যাও।"

জলিল লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। ধীরে বলল, "কী যে বলেন ফিরোজ ভাই, আমি তো আপনার কথাটা ভেবেই পরে হ্যা বললাম।"

ফিরোজ দাঁত বের করলো, "হয়েছে, আর মিথ্যা বলে তোমার পাপের হিসাবটা ভারি না করলেও হবে।"

জলিল তার লাজুক লাজুক ভাবটা ধরে রেখেই পরবর্তি প্রশ্নটা করে বসল ফিরোজকে, "ভাই, এই ঘরে তো ওই ব্যাটা আছে বলে মনে হয় না! তাহলে আমরা এখানে কী করছি?"

ফিরোজ রহস্য করে বলল, "দেখই না কী করি!"

অধীর আগ্রহ নিয়ে আমি আর জলিল অপেক্ষা শুরু করলাম ফিরোজ কী করে সেটা দেখতে।

ফিরোজ বেশি সময় নষ্ট না করে এগিয়ে চলল সিন্দুকটার দিকে। আমি প্রমাদ গুনলাম, ওই সিন্দুকে যে কিছু নেই সেটা জলিল আর ফিরোজ না জানলেও আমি তো ভাল করেই জানি। দেখলাম জলিল হা করে তাকিয়ে আছে সিন্দুকটার দিকে। সেও বুঝে ফেলেছে ফিরোজ ওটা নিয়েই কিছু একটা করবে।

বিস্ময় চেপে না রাখতে পেরে সে ফিরোজকে বলল, "ও ভাই! এত বড় সিন্দুকটা কোথা থেকে এল? সর্বনাশ! এরমধ্যে কত টাকা আছে? ভাই ছবি চুরি না করে তো শুধু এই সিন্দুক ঝাড়লেই আর কিছু লাগে না!"

ফিরোজ পেছনে ঘাড় ফেরাল। বিরক্তির সাথে বলল, "আরে তুমিও যেমন বোকা! এই সিন্দুকে আর কতই বা টাকা আছে, সেটাকে ভাগ করলে তুমি যা পাবে তা এক দুই বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে! আমাদের আরও বড় ভাবতে হবে বুঝলে? নজরটা একটু বড় বানাও জলিল, না হলে এই বিশাল দুনিয়ায় তুমি মাথা তুলে দাঁড়ানোর আগেই দেখবে কেউ তোমাকে পা দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলেছে।"

ফিরোজের কথা শুনে জলিল গম্ভির হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বিশাল বোদ্ধার মতো বলল, "তা ফিরোজ ভাই যা বলছেন, একদম খাটি কথা। না হলে এত বছর স্যারের জন্য কাজ করলাম, কই উনি তো আমাকে কখনও এই বাড়িতে একটা ঘর দিয়ে থাকতে বললেন না। আমার জন্য থাকল সেই ভাড়া বাড়ির ছোট্ট ঘর। এই নিয়ে বাসায় বউ এর সাথে প্রায়ই ঝামেলা হয়। বউ বলে, স্যারের মালিরও আলাদা

BanglaBook.org

বাসা আছে, আর আমার কিছুই নাই। আমার মূল্য নাকি মালির থেকেও কম।"

ফিরোজ নম্বর মিলিয়ে সিন্দুকের ম্যানুয়াল কম্বিনেশান লকের চাকতিটা ঘুরাতে ঘুরাতে বলল, "ভুল বলে নি। এ বাসার মালির তো একটা বাড়ি আছেই, দারোয়ানেরও আছে। যদিও সেটা চিরস্থায়ি কিছু নয়, চাকরি গেলে সেটাও যাবে। তবুও আছে তো, নাকি! সেদিক থেকে দেখতে গেলে তুমি আসলে বঞ্চিতই হয়েছ একরকম। তাই তো পরিকল্পনাটা বানানোর সময় তোমাকেই সঙ্গি হিসেবে বেঁছে নিয়েছি, ওদেরকে দলে নেইনি।"

বিগলিত হয়ে গেল জলিল। বলল, "তা ভাই আপনার দয়ার শরীর, না হলে আমার মতো একটা সাধারণ ড্রাইভারকে দলে না নিলেও কিছুই যেত আসত না। তবে যাই বলেন, দারোয়ান আর মালিকে ওই ব্যাটারাই কাবু করে ফেলেছে শুনে খুব ভাল লেগেছে। ওদের সামলানো ঝামেলা হয়ে যেত।"

ফিরোজ কম্বিনেশান লকের শেষ নম্বরটা মেলাতে মেলাতে বলল, "না, সেটা কোনও সমস্যা হতো না, সেই প্ল্যান করা ছিল। এই ঘরের ছোকরা দুটোকে যেভাবে ব্যবস্থা করেছি ওদের জন্যও সেই একই ব্যবস্থা ছিল। রিহা নিজের হাতে ওদেরকে খাবার দিত।

"বুঝলে জলিল, সুন্দরি মেয়েদের যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তা হলে তার থেকে কার্যকর আর ভয়ংকর অস্ত্র আর কিছুই হতে পারে না!"

জলিল এই কথা শুনে খিক খিক করে হেসে উঠল। ষড়যন্ত্রটা ধরে ফেলেছে এমন ভাব করে বলল, "তা যা বলেছেন ফিরোজ ভাই, একদম একশত ভাগ খাঁটি কথা। আর আমার বউটারে দেখেন, রূপের ছিটে ফোঁটাও নাই, খালি পেটে ভরা ঝগড়া! কী দেখে যে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম ওটাকে, কে জানে! একবার খালি হাতে টাকা পাই, ওর মুখের উপর গিয়ে ছুঁড়ে মরাব। বুঝলেন ভাই, একদম মুখের উপর!"

ম্যানুয়াল লকের উপর থেকে হাত উঠিয়ে ফিরোজ আচমকা ঘুরে দাঁড়াল, কড়া ভাষায় শাসিয়ে দিলো জলিলকে, "খবরদার, ভুলেও এ কাজ করবে না। তুমি টাকা ছুঁড়ে মারলে বউ হাজারটা প্রশ্ন করবে। সে তো আর তোমার মতো বেকুব না। ঠিক বের করে ফেলবে তুমি কীভাবে টাকা পেয়েছ। তাই, টাকা তুমি বউকে দেবে না, অন্য কোথাও রাখবে। আর বাসায় গিয়ে যেভাবে জীবন কাটাচ্ছিলে ঠিক সেভাবেই থাকবে। বাইরে ফুর্তি করবে আর বাসায় স্বাভাবিক। তারপর যদি তুমি বউ এর সাথে না থাকতে চাও, তাহলে তাকে তালাক দিয়ে দিও। ও চলে গেলে জীবন ধারা পরিবর্তন করতে পারবে। আরেকটা বিয়েও করতে পারবে। তোমার ইচ্ছে।"

BanglaBook.org

"তোমার মতো লোকেরা সবসময় আবেগ দিয়ে কাজ করে, সেটাই আসল সমস্যা। যখন কাজ করবে তখন আবগে পেছনের পকেটে রাখবে, বুঝলে? কাজের মধ্যে আবগে এলেই গিটঠু লাগে, তখন সেটা থেকে আর বেরিয়ে আসা যায় না। আমাকেই দ্যাখো না, দশ বছর ধরে স্যারের জন্য কাজ করছি! কী নেই আমার, একজন সাধারণ মানুষের যেসব চাহিদা থাকতে পারে সবগুলোই পূরণ হচ্ছে, স্যার নিজে ব্যবস্থা করেছেন। এত কিছুর পরও তার বাড়িতেই চুরি করছি। তোমার মতো যদি আবেগের মধ্যে ডুবে থাকতাম তা হলে কখনও এটা করতে পারতাম না।"

জলিল লজ্জিতভাবে একটা হাত উঠিয়ে দিলো, "থাক ভাই, আর বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। হঠাৎ অনেক টাকা পেয়েছি এটা বাইরের কেউ জানতে পারবে না। আপনার সাথে দেখা না হলে মূর্খই থেকে যেতাম ভাই। আপনি মানুষ না! ফেরেশতা।"

ফিরোজ জলিলের কথা শুনে হাসতে হাসতে ডিজিটাল লকে নম্বর বসাতে বসাল। "এটা ভেবে ভুল করো না জলিল। আমি কোনও ফেরেশতা না, আমি হচ্ছি শয়তান! একদম এক নম্বরি শয়তান। হা হা হা।"

ফিরোজে হাসি ঘরময় আলোড়ন তুলল।

বিগলিতভাবে জলিল ফিরোজের দিকে তাকিয়ে রইল। সেও জানে ফিরোজ শয়তান, কিন্তু কখনও কখনও শয়তানও কারও কারও জন্য ভগবানের মত কাজ করে। আর জলিলের ক্ষেত্রে ফিরোজ ঠিক সেই কাজটাই করছে। আমার ইচ্ছে করছিল এখনই আলমারি থেকে বেরিয়ে দুজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে আসি। আমরা না হয় চুরি করতে এসেছিলাম বাইরে থেকে, কিন্তু এরা সেই লোকের ঘরে চুরি করছে যে অন্ন বস্ত্র দিয়ে লালন পালন করেছে। তাদের বেঁচে থাকার রসদ যুগিয়েছে। আসলে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ঠিক কতটা বিত্তের প্রয়োজন সেটা সে নিজেই নির্ধারণ করতে পারে না। আর বহিসেবে বাজে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে জীবনকে অন্ধকারে নিয়ে ফেলে। জলিল আর ফিরোজ তার-ই দুটো বড় উদাহরণ।

নিজেকে অনেক কষ্ট করে আলমারির ভেতরেই স্থির রাখলাম। জলিলের হাতে ধরা বন্দুকটা এখান থেকে বেরিয়ে পড়লে আমাকে খুব বেশি একটা সহায়তা করবে বলে মনে হচ্ছে না, সুতরাং এখনে থাকাই ভাল।

ফিরোজ অবশেষে সিন্দুকের দরজাটা খুলতে সক্ষম হলো। সিন্দুক খুলতেই দুজনের চেহারাই পাল্টে গেল। জলিল দিশেহারা হয়ে বলল, "একি ভাই! টাকা কই?"

"এখানেই তো থাকার কথা ছিল? গেল কই?" বিভ্রান্তভাবে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল ফিরোজ।

"টাকার তো আর হাত পা গজায়নি যে চলে যাবে! আপনি ঠিক জানতেন,

BanglaBook.org

এখানেই টাকা ছিল?" ফিরোজকে ফের প্রশ্ন করল জলিল। ওর মাথা খারাপ দশা, সম্ভবত এই টাকাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো স্বপ্ন ইতিমধ্যে সাজিয়ে ফেলেছিল। টাকা নেই দেখে সবগুলো স্বপ্ন মুহূর্তে ভেঙে গেছে।

এবারে ফিরোজ জলিলের চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল, "জলিল, ভাল করে ভেবে বল তো আজকে বাইরে যাওয়ার সময় স্যার কি কোনও বড় বাক্স নিয়ে গেছিল?"

জলিল কিছুক্ষণ চুপ ভেবে উত্তর দিল, "কই না-তো! আমার তো মনে পড়ছে না সে রকম কিছু।"

ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুতে জোরে ঘুসি মেরে বসল ফিরোজ। ব্যাথা পেল। হাতটা ডলতে ডলতে বলল, "তা হলে গেল কই?"

সহসাই জলিল গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলার মত করে বলল, "ফিরোজ ভাই! ওই ফাজিলগুলা নেয় নাই তো?"

ফিরোজ হেসে উড়িয়ে দিলো, "ধুর, ওরা নেবে কীভাবে! ওরা তো লকের কম্বিনেশান নম্বরই জানে না!"

জলিল তার ধারণটাকে সহজে উড়ে যেতে দিলো না। জোর দিয়ে বলল, "আরে ভাই, নিতেও তো পারে! নম্বর না জানলেও কোনও না কোনও উপায়ে খুলে ফেলতেই পারে। সিনেমাতে দেখেন না, কীভাবে তালা খুলে ফেলে কেরামতি করে!"

জলিলের কথা উড়িয়ে দিতে গিয়েও ফিরোজ ঠিক উড়িয়ে দিতে পারে না। নিজেই যুক্তি খোঁজার চেষ্টা চালাল সে, "সিনেমা আর বাস্তব জীবন এক হলো নাকি? তাছাড়া এতগুলো টাকা নেবেই বা কই? ওদের তো আমরা ধরেই ফেললাম।"

কথাটা বলতে বলতেই ফিরোজের চোখ ঘরে পড়ে থাকা ব্যাগগুলোর দিকে গেল। জলিলও ফিরোজের চমকে ওঠা দৃষ্টি অনুসরণ করে করে ব্যাগের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হল। এরপর সিন্দুকটা খোলা ফেলে রেখেই ফিরোজ আর জলিল ব্যাগ দুটোর দিকে এগিয়ে গেল।

দম বন্ধ করলাম। শুমেল আর আমার ব্যগের থেকে সব টাকা রঞ্জনের বড় ব্যাগটাতেও ভরা যায়নি। পরিমান অনেক বেশি ছিল; তবে, সিংহ ভাগই ভরে ফেলতে পেরেছিলাম। এখনও ওখানে কয়েকটা হাজার টাকার নোটের বান্ডিল পড়ে রয়েছে।

ফিরোজ আর জলিল, দুজনে দুটি ব্যাগ ধরল, পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

জলিল উত্তেজিতভাবে বলল, "ভাই, দেখেছেন টাকা। বলছিলাম না টাকা

BanglaBook.org

ওরাই নিয়েছে! দেখলেন আমার কথাও যে ঠিক হয় মাঝে মধ্যে! আপনি তো কোনও গুরুত্বই দিলেন না তখন!"

ততক্ষণে ফিরোজও শুমেলের ব্যাগ খুলে দুই বান্ডিল টাকা হাতে তুলে নেড়ে চেড়ে দেখা শুরু করেছে। সে ভ্রুকুটি করে বলল, "কিন্তু এখানে তো সব টাকা নেই। সামান্যই রয়েছে! সিন্দুকে এত অল্প টাকা ছিল না। নাহ, আমার মনে হয় এই টাকা ওরাই নিয়ে এসেছে, এটা সিন্দুকের টাকা না।"

জলিল মানতে চাইল না। এতক্ষণে তার একটা নির্দেশনা সঠিক হয়েছে দেখে বাড়তি উদ্যম পেয়ে গেছে। সে গলা চড়িয়ে ফিরোজকে বলল, "আরে রাখেন ভাই, আমি যা বলি শুনেন। এই টাকা ওরাই নিয়েছে। ওই ছেলেটাকে তো আমরা এখনও ধরতে পারি নাই। আর তাছাড়া..."

ফিরোজ আগ্রহি হয়ে প্রশ্ন করলো, "তাছাড়া?"

"তাছাড়া ওই যে ষণ্ডাগণ্ডা মতো একজনকে দেখলাম তখন দোতালার এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করছিল! সেও নিতে পারে," নিশ্চিতভাবে বলল জলিল।

ফিরোজ গম্ভির হয়ে গেল। "কিন্তু ও কীভাবে নিল? কখন নিল?!"

নিজের যুক্তিগুলো ফিরোজকে ভাবাচ্ছে দেখে জলিল আরও উৎসাহিত হয়ে বলল, "আপনি আমাকে আগে বলেন, যখন ওদের বডিগুলো এখান থেকে সরালেন তখন কি এই ব্যাগগুলো সার্চ করেছিলেন?"

ফিরোজ অসহায়ভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। তার মাথা নাড়া শেষ হতেই জলিল বলল, "আমার মনে হয় আপনি চলে যাবার পরেই ও এখানে এসে টাকা সরিয়ে ফেলেছে।"

জলিলের যুক্তি পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারল না ফিরোজ, দেখলাম সে ঘরের মধ্যে আবার পায়চারী শুরু করেছে।

"এতগুলো টাকা সরিয়ে ফেলল! ইশ!" হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

পিস্তলের হাতলে মুঠো শক্ত করে জলিল বলল, "তা হলে এখন কী করব ফিরোজ ভাই?"

ফিরোজ মাথা চুলকাল। "সেটাই ভাবছি। ওই ষণ্ডা গণ্ডা মার্কা লোকটা যদি টাকা নিয়ে থাকে তা হলে সেটা উদ্ধার করা খুব মুশকিল হয়ে যাবে!"

জলিল ভুরু কুঁচকে ফেলল। "মুশকিল কেন হবে ফিরোজ ভাই? আমার সাথে পিস্তল আছে না!"

"এই পিস্তল তুমি কোথা থেকে পেয়েছ?" কঠিনভাবে জলিলকে প্রশ্ন করল ফিরোজ।

BanglaBook.org

বিন্দুমাত্র দেরি না করে জলিল সাথে সাথে উত্তর দিলো, "আপনাকে না বললাম, ওই যে, যে ছেলেটাকে গ্যারাজে বেঁধে রেখেছি, ওর থেকেই তো নিলাম।"

ফিরোজ নিজের কোমরে গোঁজা পিস্তল তুলে ধরল। দেখেই চিনতে পারলাম। রঞ্জনের পিস্তল!

ফিরোজ পিস্তলটা জলিলের সামনে নাচাতে নাচাতে বলল, "এটা দেখছ, এটাও আমি ওদের একজনের থেকেই পেয়েছি। সুতরাং, বাকি দুজনের কাছে যে আমাদের মতই অস্ত্র নেই সেটা ধরে নেয়া ভুল হবে। বুঝেছ?"

ফিরোজের হাতে পিস্তল দেখে জলিল ঢোক গিলল। মনে হয় ভেবে নিয়েছিল সে একাই গোলাবারুদ আর হাতিয়ারের মালিক। ফিরোজ তাকে হতভম্ব অবস্থাতে রেখেই বলে চলল, "আর যদি ভেবে থাকো ওই মোটুকে আগের ছেলেটার মতো খালি হাতে কাবু করে ফেলতে পারবে তা হলে ভুল ভাবছ। ওর গায়ে যা শক্তি, তাতে আমাদের দুজনকে একসাথেই কাবু করে ফেলতে পারবে।"

"তাহলে উপায়?"

"উপায় কিছু একটা হবে, সেটা নিয়ে এখন না ভেবে আগে অন্য কাজগুলো সেরে নিই চল," জলিলকে তাড়া দিলো ফিরোজ।

দেখলাম, ফিরোজের কথা শেষ হতেই ওরা দুজন সিন্দুকটা খোলা অবস্থাতেই রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাথাতে অনেকগুলো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রথমত, কাল্লু এখনও ধরা পড়েনি, এটা ভাল খবর। দ্বিতীয়ত, ফিরোজ আর রিহারাও আমাদের মতোই ছবি চুরি করার পরিকল্পনা করেছে। তৃতীয়ত, আমার উপর ওদের ভীষণ রাগ, সুতরাং ওদের হাতে ধরা পড়লে অন্য যে কেউ কিছু কিল ঘুসি খেয়ে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ থাকলেও আমার সেটা নেই। আমার কপালে এর থেকে অনেক বড় খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে। চতুর্থত, ফিরোজ লোকটা বুদ্ধিমান আর হৃদয়হীন। এই ধরনের লোক সাধারণত খুবই ভয়ংকর হয়। তাই, অনেক সাবধানে কাজ করতে হবে।

পরের পদক্ষেপটা কী নেব আলমারির ভেতর বসে সেটাই ভাবতে শুরু করলাম।

BanglaBook.org

১১

সময়: রাত ০৭:২১

প্রায় সাড়ে সাত মিনিট ভেবেও কোনও রাস্তা বের করতে পারিনি। দুঃখজনক হলেও সত্যি। এই প্রথমবার রঞ্জনকে ধরে আচ্ছামত পেটাতে ইচ্ছে করছিল। নিদেনপক্ষে আমাকে একটা খেলনা পিস্তল দিলেও কাজে লাগত, তা-ও দিলো না। নিরস্ত্রভাবে দুজনের মোকাবিলা করা আমার পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব না। মনে হচ্ছে আগে কাল্লুকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন। এত বড় বাড়িতে ওকে খুঁজে পাওয়া অনেকটাই জটিল।

বারেক কালিয়ানের ঘর থেকে বাইরে এলাম। এখানে আর কোনও কাজ নেই। পুরো দোতালাটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করলাম। করিডোরের সবগুলো বাতি এখন জ্বলছে। পথটা আলোয় সুসজ্জিত, দেখতে দারুন সুন্দর লাগছে। কিন্তু সেই সৌন্দর্য উপভোগের সময় কিংবা সুযোগ আমার নেই, আছে শুধুই তাড়া করে বেড়ানো আতংকের অভিশাপ।

আরও একটি সহজাত প্রবৃত্তি ক্রমাগত জানান দিচ্ছিল আমি কতটা অসহায়। সেটি হলো ক্ষুধা। সেই সকালে এক কাপ চা খেয়েছি, তারপরে এতক্ষণ হয়ে গেছে কিছুই পেটে পড়েনি। অন্য কোনও দিন হলে এতক্ষণে ভাত, মাংস কিংবা ডিম, হয়তোবা তরকারি, আর তার সাথে কোল্ড ড্রিংকস অবশ্যই পেটে পড়তো। কাল্লু আর রাহাতের আবার হার্ড ড্রিংকসও চলে। আমি ওসব দিকে হাত বাড়াই না। তবে এখন মনে হচ্ছে দুই পেগ মেরে দিতে পারলে মন্দ হতো না, হয়তো পরিস্থিতিটা আরেকটু সহজ হয়ে আসতো।

কাল্লুর ক্ষুধা অবশ্য আমার থেকেও বেশি, আমরা পাঁচজনে মিলে আলাদাভাবে কোনও পার্টি করলে দেখা যায় রান্না খাবারের অর্ধেকটাই ও সাবাড় করে দিয়েছে। প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর অন্তর না খেলে ওর শরীর নাকি দুর্বল হয়ে যায়। এটা অবশ্য আমার কথা না, কাল্লুর নিজের কথা। বহুবার হেসে উড়িয়ে দিয়েছি, কারণ ও যদি দুর্বল শরীরেও আমাকে একটা ঘুসি মারে তা হলে অন্তত পাঁচ হাত দূরে ছিটকে যাব। সবল শরীরে মারলে কয় হাত দূরে পড়ব সেটা সঠিক হিসাব করে বলা যাচ্ছে না।

আচ্ছা, কাল্লু কি তাহলে রান্নাঘরে যেতে পারে? সহসাই প্রশ্নটা মাথায় ঘুরপাক খেয়ে চলল। এর জবাব পেতে হলে আগে রান্নাঘর খুঁজে বের করতে হবে। এখনও

BanglaBook.org

এই জিনিসটা খুঁজে পাইনি। তবে তিন তলা মোটামুটি দেখা হয়েছে, ওখানে থাকার সম্ভাবনা কম। হয়তো ওটা দোতলাতেই আছে। কিন্তু কোথায়?

রান্নাঘর খোঁজা শুরু করলাম। সেই তখন থেকেই এ-ঘরে সে-ঘরে ঢুকছি, বের হচ্ছি। এতক্ষণে আমিও বিরক্ত, কিন্তু কী করবো এছাড়া তো আর অন্য কোনও উপায়ও নেই। এবারে ঘরের মধ্যে না ঢুকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার চেষ্টা চালালাম, কোনটাকে রান্নাঘরের মতো দেখায়। সবগুলো ঘর বাইরে থেকে এক রকম দেখায় না, দরজায় ভিন্নতা আছে। হয়তো রান্নাঘরেরও এরকমই কিছু একটা ভিন্নতা থাকবে যেটা দিয়ে আলাদা করে চেনা যাবে।

ধারণা ভুল প্রমানিত হলো না, কিছুক্ষণ পরেই আমি রান্নাঘর খুঁজে পেয়ে গেলাম। তবে সেটা যে রান্নাঘর তা আসলে দরজা দেখে বোঝা গেল না, বোঝা গেল দরজার ফ্রেমে লাগানো একটা মাঝারি স্টিলের প্লেটে ইংরেজিতে 'কিচেন' লেখা দেখে। যাক যেভাবেই হোক এটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। এখনও মূল কাজটাই বাকি, আবিষ্কারের পুরোটাই বিফলে যাবে যদি রান্নাঘরে কাল্লুকে না পাওয়া যায় তবে। ঘটনাটা আরও খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে যদি সেখানে কাল্লুর বদলে ফিরোজ কিংবা জলিলকে ঘাপটি মেরে আমার জন্য বসে থাকতে দেখা যায়।

রান্নাঘরের বাইরেটা শুনশান। ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ পেলাম না, মনে হচ্ছে ঢুকেই দেখতে হবে। যদিও শব্দ যখন নেই, তখন কাল্লুর ভেতরে থাকার সম্ভাবনা খুব কম। ঘাপটি মেরে থাকার লোক ও নয়, তাতে যতই বন্দুক আর পিস্তলের ভয় থাক না কেন।

দরজা ঠেলে ভেতর ঢুকলাম। রান্নাঘরের ভেতরটা অন্ধকার। হয়তো বিকেলের পরে কেউ আর এখানে আসেনি, তাই ঘরে আলোও জ্বলেনি। ব্যাপারটাতে খটকা লাগল। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ি এ ঘরেও আসার কথা ছিল। বাড়িতে একজন রাঁধুনি থাকার কথা, তাকেও বন্দি বানানোর প্ল্যান ছিল। এখনও লোকটাকে দেখা যায়নি! তাহলে কি সে রিহাদের সাথে হাত মিলিয়েছে? নাকি হাত মেলায়নি দেখে তাকেও বন্দি বানিয়ে রাখা হয়েছে? ঘটনাটা খুবই ধোঁয়াটে। তবে রান্নাঘরে যে কাল্লু নেই সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, থাকলে এতক্ষণে আওয়াজ দিতো।

আলো জ্বালিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। ভেতরে ক্যামেরা থাকার ভয় আছে, তবুও ঝুঁকি নিলাম। ফিরোজ আপাতত ফিল্ডে নেমে পড়েছে, হয়তো কেউ ক্যামেরাগুলো মনিটর করছে না। তবে ওদের আরও সঙ্গি থাকলে বিপদ! বলা যায় না, যে ভাবে শিল্পীর মা আবিষ্কার হলো, তাতে আরও মানুষ থাকলেও অবাক হব না।

BanglaBook.org

বাড়ির অন্য ঘরগুলোর মতো এটাও সাধারনের থেকে একটু বেশিই যেন! এতো বড় রান্নাঘর জীবনে দেখিনি। বিশাল তিনটা ফ্রিজ পাশাপাশি রাখা, তার পাশে মশলাপাতি রাখার বিরাট বড় কাঠের আলমারি। একদম মাটি থেকে শুরু করে ছাদ ছোঁয়ার জন্য যেন অর্ধেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে সেগুলো। ঘরের একপাশে পাশাপাশি চারটা বড় সিঙ্ক, তার পাশেই লম্বা ওয়ার্ক বেঞ্চ, যেখানে সম্ভবত তরি-তরকারি কিংবা মাছ-মাংস কাটাকাটি করা হয়। তার পাশ ঘেষেই দুটো বড় বেকিং ওভেন। এক একটি ওভেনের উপর চারটি করে বৈদ্যুতিক চুল্লি। এক পাশে টেবিলের উপর রাখা বড় মাইক্রোওভেন। অপর একটি টেবিলে ব্রেডার মেশিন রাখা। ঘরের মাঝখানে বড় একটা প্লাটফর্ম চতুর্ভুজ বক্সের মতো বসানো। তার নিচ দিকটায় ছোট ছোট দরজা রয়েছে। দেখে মনে হয় সেখানে চাল ডাল এসব খাবারের মজুদ রাখার ব্যবস্থা আছে।

রান্নাঘরটা এত সুন্দর যে দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়। বাড়িতে যে কয়জন মানুষ তাতে এত বড় আর সুন্দর রান্নাঘর না হলেও চলে। কিন্তু, বারেক কালিয়ান বলে কথা, সর্বত্র শিল্পের ছোঁয়া না রাখতে পারলে তার সম্ভবত শান্তি হয় না!

দেরি না করে দরজা দিয়ে ডানদিকে এগিয়ে একটা ফ্রিজ খুললাম। ভেতরে নানা রকমের খাবার দাবারে ঠাসা। কিন্তু কোনটা খাই! আর কীভাবেই বা খাই! সঙ্গিরা সব আটকে পড়েছে আর আমি কিনা খাবার কথা ভাবছি? নিজের উপর অশ্রদ্ধা চলে এল। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনিষীদের একটি বাণীর কথা মনে পড়ে গেল– পেটে পড়লে পিঠে সয়।

এর পরেও কিছুটা সংকোচ হচ্ছিল বটে কিন্তু তখনই আরও একটা বাণী মনে পড়ল–খালি পেটে কোনও কাজ সঠিকভাবে হয় না।

এই বাণী কোন পেটুক দিয়েছে জানি না, সেটা ভাবার কোনও প্রয়োজনও নেই, এখন দরকার শুধু খাবার।

ফ্রিজ থেকে জুসের বোতল নিয়ে অর্ধেকটা জুস ঢকঢক করে ফাঁকা করে দিলাম। এরপর ভেতরে থাকা সুদৃশ্য পেস্ট্রির তিন চার পিস কর্ণা কপ উধাও করে দিলাম। পরের ফ্রিজ খুলালাম, সেখানে দেখলাম কয়েক স্লাইস পিজা। দারুন লোভ হলো। সকালে শিঙ্গারা না খেতে পারার বেদনাটা দ্রুত ফিরে এল। হোক বাসী, এটাই খেতে হবে এখন। ভেতর থেকে এক স্লাইস পিজা হাতে তুলে নিলাম, এরপর ফ্রিজ থেকে কয়েকটা টমেটো সসের প্যাকেট বের করে নিয়ে পিজার উপর মাখাতে শুরু করলাম। বড়লোকের শখ! বোতল না রেখে প্যাকেট কিনেছে।

পিজায় কামড় বসাতে বসাতে প্লাটফর্মটার দিকে এগুলাম। বাসি হলেও খেতে

BanglaBook.org

খারাপ লাগছে না, যদিও পেটে গ্যাস হবে সেটা বলাই বাহুল্য। পিজ্জা উপভোগ করতে করতে প্লাটফর্মের সাথে এসে দাঁড়াতেই একদম উল্টো দিকে একটা বেওয়ারিশ প্লেট দেখলাম। প্লেটের উপর কয়েকটা শিঙ্গারা। তার মধ্যে একটা আবার আধা খাওয়া। কৌতুহলি হয়ে প্লাটফর্মের ডান দিক থেকে ঘুরে প্লেটের কাছাকাছি এগিয়ে চললাম।

মোড় ঘুরে প্লেটের একদম কাছে যাওয়ার ঠিক আগেই হঠাৎ কিছু একটাতে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। মেঝে থেকে উঠতে গিয়ে আতংকের সাথে আবিষ্কার করলাম, আমাকে হোঁচট খেতে বাধ্য করা বস্তুটি আর কিছুই নয়, সেটা কাল্লু!

পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গেল, যার ভরসাতে এতক্ষণ শক্তি পাচ্ছিলাম সেই হতভাগা এখানে শুয়ে আছে। বেঁচে আছে না মরে গেছে কে জানে! পরীক্ষা করার জন্য ওর বুকে কান পাতলাম। নাহ, হৃদপিণ্ডটা এখনও ধুক ধুক করছে, তার মানে মরেনি, অজ্ঞান হয়েছে। ওকে ধরে বেশ কতক্ষণ ঝাঁকাঝাঁকি করলাম, গালে সাহস করে গোটা দশকে চড় চাপড়ও দিলাম, কিছুতেই কিছু হলো না। কাল্লু সামান্য নড়ে উঠল, ওর ঘুম ভাঙল না। হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। শিঙ্গারার প্লেটের আধখানা খাওয়া সিঙ্গারাটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এই গাধাটাও রঞ্জন আর শুমেলের মতই শিঙ্গারা খেয়েই অজ্ঞান হয়েছে। কিন্তু যেটা খটকা লাগছে, কাল্লুর মতো খাদক একটা শিঙ্গারা অর্ধেক খেয়ে রেখে দেবেই বা কেন? ও তো পুরো জিনিস না খেয়ে কখনও শান্তি পায় না। ব্যাপারটা পুরোই ওর স্বভাব বিরুদ্ধ।

প্লাটফর্মের বামদিকে ঘুরে অবশেষ আমি প্লেটটার একদম কাছে পৌঁছলাম। আধ-খাওয়া সিঙ্গারাটা হাতে তুলে দেখলাম সেটার উপর কামড়ের চিহ্ন আছে। হঠাৎ সামনে থেকে আওয়াজ ভেসে এল,

"হ্যান্ডস আপ।"

অবাক হয়ে তাকালাম, এত সহজে ধরা খেয়ে যাব কল্পনার বাইরে ছিল। এতক্ষণ পালিয়ে পালিয়ে তাহলে কী লাভ হলো? শেষ পর্যন্ত এইভাবে যদি ধরা পড়তে হয়!

সামনে যা দেখতে পেলাম তাতে আরও বেশি অবাক হতে হলো। রিহা, ফিরোজ কিংবা জলিল না, বরং অন্য একজন দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। লোকটাকে অবশ্য চিনতে পারলাম, এ বাড়ির রাঁধুনি স্বয়ং। তার হাতে উদ্ধত পিস্তল, আমার দিকেই সরাসরি তাক করা। তবে চিনি কিংবা নাই চিনি, হাতে পিস্তল ধরা থাকলে ব্যক্তিকে যথার্থ সম্মান দিয়ে কথা বলা উচিৎ।

BanglaBook.org

সিঙ্গারাটা ধরা অবস্থাতেই উপরের দিকে হাত তুলে বললাম, "ভাই, ধরেই ফেললেন শেষ পর্যন্ত। আপনিও তা হলে ফিরোজদের দলে আছেন! নাহ, আপনাদের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।"

রাঁধুনি আমার দিকে তাকিয়ে কটমট করে বলল, "বেশি চালাকি করার চেষ্টা করবি না। তোরা যে ফিরোজের সাথেই কাজ করছিস সেটা ভালো করেই জানি! আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই।"

আমার থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সে, বুঝলাম সেটা যাতে অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়তে না পারি সেজন্য সাবধানতা। পৃথিবীর মানুষগুলো দিন দিন যদি এত সাবধানি হয়ে যায় তাহলে তো সমস্যা! আমার মতো চোরদের ভাতে মরতে হবে।

এক পা এগিয়ে বললাম, "ভাই যে কী বলেন! আমি ফিরোজের সাথে কাজ করতে যাব কেন? আপনার কী দেখে এটা মনে হলো যে আমি ওই শয়তানটার দলে আছি?"

ধমক দিলো ব্যাটা, "খবরদার, এক পাও সামনে আগাবি না, পিছনে যা, পিছনে যা বলছি।"

ধমক শুনে এক পা পিছিয়ে ফের আগের জায়গায় চলে গেলাম।

আমি পিছিয়ে যেতেই লোকটা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "তুই যদি ফিরোজের লোক না হতি তাহলে সিঙ্গারাটা খেলি না কেন? পিজা তো দিব্বি সস মাখিয়ে খাচ্ছিলি, ঠাণ্ডাই। শিঙ্গারা খেলি না কেন? তার মানে তুই জানিস যে এই শিঙ্গারায় ওষুধ মেশানো আছে, খেলে তুই অজ্ঞান হয়ে যাবি।"

গোবেচারা ভাব করে বললাম, "ভাই, আপনি যেমন জানেন যে এটার মধ্যে ওষুধ আছে আমিও তেমনি জানি। তাই খাই নি। এটা জানার জন্য ফিরোজের দলে যোগ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।"

রাঁধুনি কটাক্ষ করে বলল, "কেন? তুই অন্তর্যামি নাকি? না খেয়েই বুঝে ফেলিস কোন খাবারে কী আছে!"

আলতো হেসে বললাম, "একই কথা তো আমি আপনাকেও বলতে পারি! আপনি কীভাবে বুঝলেন এটার মধ্যে ওষুধ আছে?"

আমার কথা শুনে রাঁধুনির চেহারাটা কালো হয়ে গেল, সে চোখ মুখ কঠিন করে বলল, "কেন, মনে নেই? সকাল বেলা এটা খাইয়েই আমাকে অজ্ঞান করে ফেললি তোরা। তারপর তো বেঁধে এখানেই ফেলে গিয়েছিলি। অনেক কষ্টে মুক্তি পেয়েছি। এখন তোদের সবাইকে আমি জেলে ভরার ব্যবস্থা করব। আমাকে চিনিস নাই,

BanglaBook.org

আমার নামও আব্বাস, তোদের সব কয়টারে দেখিয়ে দিব আমার সাথে ফাইজলামি করার ফলটা কত খারাপ হতে পারে!"

যাক! ব্যাটার নাম তাহলে জানা গেল, আব্বাস, ভালো নাম, নামে একটা জাঁদরেল ভাব আছে। চেষ্টা করে দেখতে হবে ব্যাটাকে দলে ভিড়ানো যায় কি না!

ব্যাখ্যা করার মতো করে বললাম, "আমি ভাই আপনার থেকে একটু বেশি সৌভাগ্যবান, তাই খেয়ে দেখতে হয়নি। আমার সহকর্মিরা ওটা খেয়ে অজ্ঞান হয়েছে, আর আমি দেখে শিখেছি। তবে আব্বাস ভাই আপনিও রিহার ফাঁদে ওদের মতোই পা বাড়িয়ে দিলেন! খুবই দুঃখজনক।"

আব্বাস আবার ঝাড়ি মারল, "ওই, চুপ কর। তুই ফিরোজের লোক না হলে কীভাবে জানলি রিহা আমাকে ওই শিঙ্গারা খাইয়েছে? বল? জবাব দে।"

"আরে ভাই, সামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকলেই এটা বের করে ফেলা সম্ভব। ওই রিহাই আমাদের সিঙ্গারা এনে দিয়েছিল, সুতরাং ধারণা করে নিয়েছি ও-ই আপনাকেও শিঙ্গারা দিয়েছে। এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার ধারণা ঠিকই আছে," যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বললাম।

কথাগুলো শুনে আব্বাস কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হয়ে গেল। এত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলছি দেখে আমার দাবি ঠিক ফেলে দিতে পারল না। ভ্রুকুটি করে বলল, "সত্যি সত্যিই ফিরোজের লোক না হয়ে থাকিস, তা হলে তুই কে?"

এবারে কিছুটা সাহস ফিরে পেলাম। আব্বাস এখন আমাকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে চাইছে না। সুতরাং, ওকে ঠিক সেই মিথ্যাটা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম যেটা ঘন্টাখানেক আগে বারেক কালিয়ানের মা-কে শুনিয়ে এসেছি।

আত্মবিশ্বাসি ভঙ্গিতে বললাম, "আমরা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে এসেছি। এরকম কিছু একটা হতে পারে শিল্পী আগেই সন্দেহ করেছিলেন, তাই উপর মহলের নির্দেশে একটা টিম নিয়ে তদন্ত করতে এসেছি।"

"চুপ! শালা, খালি মিথ্যা কথা!" জোর ধমক দিলো আব্বাস। তারপর বলল, "তোরা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আসছিস? আমার সাথে ফাইজলামি করার আর জায়গা পাস না! তোরা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আসলে আমি কি এইখানে গত চার মাস বসে আঙুল চুষতেছি?"

মনে হলো একটা ছোট খাটো পাহাড় ভেঙে আমার উপর পড়ল।

আমতা আমতা করে বললাম, "তা...তার মা...মানে আপনি গোয়েন্দা পুলিশ!"

এতক্ষণে মনে হয় আব্বাস কিছুটা আনন্দ পেল। সারাদিন হতাশার পর আমাকে হাতে নাতে ধরতে পেরে তার পুলিশ সত্তা যেন আবার উন্নত শির হল। সে ঠোঁটের

BanglaBook.org

কোনায় নিষ্ঠুর হাসি এঁকে বলল, "হুম, বারেক কালিয়ান আরও পাঁচ মাস আগে পুলিশকে কমপ্লেন করেন তার বাসাতে চুরির আশঙ্কা রয়েছে। তাই এই বাসার রাঁধুনি পদে গত চার মাস ধরে কাজ করছি, নজর রাখছি। তোর চেহারাটাও কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে।"

ঘটনা ক্রমশ আমার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে, এই ব্যাটা যে পুলিশ তা আগে বুঝতে পারিনি। নাহ, আজকাল পুলিশও অনেক চালাক হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাটার মুখ থেকে এটা শোনার পর এখন মনে হচ্ছে আমাদের আরও আগেই বোঝা উচিৎ ছিল। লোকটার সুগঠিত স্বাস্থ্য ওকে সাধারণ রাঁধুনির থেকে একটু আলাদা করে বৈকি!

দ্রুত সামাল দিতে চেষ্টা করলাম, "তা লাগতেই পারে, আমি তো টেলিফোন লাইনের কাজ করি। হয়তো দেখেছেন কোথাও টেলিফোন তার নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে।"

আব্বাস হিংস্রভাবে ডান থেকে বামে মাথা নাড়াল। "তুই আবার আমার সাথে মিথ্যা কথা বলছিস। তোর তো অনেক সাহস, আমি কিন্তু এক গুলিতে তোর খুলি উড়িয়ে দিব!"

"আরে আরে ভাই, রাগ করেন কেন? সত্যি বলছি। আচ্ছা বিশ্বাস না হলে দাঁড়ান আমার পকেটে টুল আছে, এক্ষুনি বের করে দেখাচ্ছি।" এই বলে, শিঙ্গারা না ধরা হাতটা পকেটের দিকে বাড়ালাম স্ক্রু ড্রাইভারটা বের করার জন্য।

তড়িঘড়ি করে বাঁধা দিলো আব্বাস, "ওই, খবরদার, ভুলেও হাত নিচে নামাবি না, তা হলে কিন্তু তোর বুকের ঠিক বামপাশে ফুটো হবে। মনে পড়েছে তোকে কোথায় দেখেছি! এই বাড়ির বাইরেই চায়ের দোকানে তোকে কয়েকবার দেখেছি। তার মানে বারেক কালিয়ান ঠিকই ধারণা করেছিলেন, তার বাড়ির উপরে তোরা নজর রাখছিলি।"

বেগতিক দেখলাম, ধরা পড়ে গেছি। কিন্তু বারেক কালিয়ান এত আগেই ঘটনাটা বুঝতে পেরে গেছে এই ব্যাপারটা সবথেকে অবাক করল। তাকে দেখে এত সচেতন বলে মনে হয় না, বরং একটা গোবেচারা টাইপের মানুষ বলেই ধারণা হয়।

"ভাই, চিৎকার দিয়েন না, আপনি তো জানেন ফিরোজ বাইরে আছে। সে আর ড্রাইভার যে কোনও সময় বন্দুক হাতে চলে আসতে পারে। তখন আপনি একা একটা অস্ত্র দিয়ে কিছুই করতে পারবেন না।"

এই কথাটা সম্ভবত আব্বাসের কিছুটা মনে ধরল, সে বলল, "হুম, তোর বাকি সঙ্গিরা কই, বল? তাড়াতাড়ি বলবি, একদম ধানাই পানাই করবি না, করলেই খতম হবি।"

BanglaBook.org

হতাশভাবে বললাম, "একজনকে তো এই রান্নাঘরেই দেখেছেন আশা করি, আর বাকি দুজন এখন ফিরোজের হাতে বন্দি। তাদের কোথায় রাখা হয়েছে জানি না।"

আব্বাস খুশি হলো। "ভাল, আমার ঝামেলা কমল," বলল সে। তারপর ভুরু নাচাল, "তোকে এখন যা করতে বলব ঠিক তা-ই করবি, উল্টা পাল্টা কিছু করার চেষ্টা করলে মরবি। আমার কথা শুনলে মরবি না, শুধু হাজতে যাবি চার-পাঁচ বছরের জন্য। কি বুঝেছিস?"

সব বুঝতে পেরেছি এরকম একটা ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। আব্বাস বলে চলল, "তোর হাতের সিঙ্গারাটা মুখে দিবি, তারপর চিবিয়ে গিলে ফেলবি। বুঝলি?"

দুর্বলভাবে প্রতিবাদ জানালাম, "আমার তো এই সব ভাজা পোড়া শিঙ্গারা খাওয়া ডাক্তারের বারণ আছে, গ্যাস্ট্রিক এর সমস্যা।"

রেগে এক পা এগিয়ে আসতে গিয়ে আব্বাস থেমে গেল। গজ গজ করতে করতে বলল, "ফাইজলামি করিস আমার সাথে, ডাক্তারের নিষেধ, তখন যে কচা-কচ বাসী পিজাটা খেয়ে ফেললি? কই কোনও সমস্যা তো হলো না তোর! যা বলছি তা-ই করবি, এক্ষুনি ওই শিঙ্গারা মুখে দিবি, আমি এক থেকে তিন গোনার মধ্যে। এক..."

বেগতিক দেখলাম, বেশি ক্ষুধা আর লোভ সামলাতে পারিনি দেখে বাসী পিজা খাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু এভাবে একের পর এক বাসী আর ভাজা জিনিস খেতে থাকলে গুলি তে না মরে গ্যাস্ট্রিকেই মরতে হবে।

"দুই..." আব্বাস গুনে চলল।

তাড়াহুড়ো করে বললাম, "আব্বাস ভাই, দাঁড়ান! খেতেই যখন হবে তখন একটা ফ্রেশ খাই। কারও খাওয়া জিনিস খেতে আমার একদম ভাল লাগে না, জীবাণু থাকতে পারে তো, তাই।"

আব্বাস গোনা থামিয়ে দিলো। "আচ্ছা ঠিক আছে তাই খা। জলদি করবি, তোর সাথে নষ্ট করার মতো সময় নেই। তোদের দুটোর ব্যবস্থা করে অন্য কাজ করতে হবে। বাসার টেলিফোন লাইনগুলোও ঠিকমত কাজ করছে না। মোবাইলটাও বদমাশগুলো নিয়ে গেছে, হেড স্টেশনের সাথে একটা যোগাযোগ করা দরকার, দ্রুত।"

আধা খাওয়া সিঙ্গারাটা প্লেটে নামিয়ে রাখলাম। যে শিঙ্গারা না খেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছিলাম এতক্ষণ, এখন সেটাই খেয়ে ঘুমাতে হবে। এই না হলে ভাগ্য! কোথায় এতক্ষণে টাকা-পয়সা আর ছবি নিয়ে চম্পট দেব, বাসায় গিয়ে

BanglaBook.org

'রসনা হোটেল'-এর জম্পেশ কাচ্চি বিরিয়ানি দিয়ে জবরদস্ত পার্টি হবে। আর সেখানে কি না এই বাসী শিঙ্গারা খেয়ে এখন বিশ্রাম নিতে হবে, নিয়তির কী নির্মম পরিহাস! প্লেট থেকে একটা আস্ত শিঙ্গারা তুলে নিলাম।

আব্বাস দাঁড়িয়ে থাকা জায়গাটা থেকে ধুপ করে একটা শব্দ আসতেই আমি শিঙ্গারার প্লেট থেকে চোখ সরিয়ে সেদিকে তাকালাম। দেখলাম সেখানে ফ্রাইং প্যান হাতে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে কাল্লু, আর আব্বাস অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। বিস্ময়ে মুখটা হা হয়ে ঝুলে পড়ল।

কাল্লু আব্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল, "শালা, আমারে মাথায় বাড়ি মাইরা অজ্ঞান করিস, নে এইবার বোঝ মজা কারে কয়!"

"তুই তাহলে ওই শিঙ্গারা খেয়ে অজ্ঞান হোস নি!" চোখ কপালে উঠল।

কাল্লু বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল, "আরে ওই অর্ধেক শিঙ্গারা খাইয়া অজ্ঞান হওয়ার কী আছে? ওর থেকে কত্ত বড় বড় নেশার ওষুধ হজম কইরা ফেললাম।"

"তা হলে তুই মাথায় বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়েছিস?" সন্দেহের সাথে জিজ্ঞেস করলাম।

ফ্রাইং প্যানটা আমার সামনে নাচাতে নাচাতে কাল্লু বলল, "এইটা দিয়া বাড়ি মারছিল। খাওন দেইখা আমার হুঁশ আছিল না, বুঝতে পারি নাই পিছন দিয়া কখন চইলা আসছে।"

"কিন্তু তোর জ্ঞান ফিরল কখন?" আবার প্রশ্ন করলাম।

কাল্লু হেসে জবাব দিল, "তোর ধাক্কা-ধাক্কিতেই জ্ঞান ফিরছে, তয় ঘাপটি দিয়া ছিলাম। পরে আস্তে আস্তে হামাগুরি দিয়া পিছনে গিয়া বাড়ি মারছি। কেমন দিলাম বল?"

কাল্লুর বুদ্ধিমত্তায় রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় এমন একটা কাজ করতে পারবে, কে জানতো! রঞ্জন থাকলে আজই ওকে একটা পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা দিত। রাহাত আর শুমেলও হয়তো ভবিষ্যতে ওকে নিয়ে ঠাট্টা করা কমিয়ে দিত।

আমি সিঙ্গারাটা হাত থেকে নামিয়ে বললাম, "তুই না থাকলে আমি তো গিয়েছিলাম ফেঁসে। যাই হোক, চল এই ব্যাটাকে দ্রুত বেঁধে ফেলি। আগের বার কীভাবে ছাড়া পেয়েছে কে জানে! এবারে এমন করে বাঁধতে হবে যেন ছুটতে না পারে। ও ছুটে গেলেই আমরা ফেঁসে যাব। পুলিশের লোক, বহুত ঝামেলা দিবে।"

আমার প্রস্তাবে সায় দিয়ে কাল্লু মাথা নাড়ল, বলল, "তুই দাঁড়া, আমি ব্যাগ থিকা দড়িটা নিয়া আসি।"

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

এই বলে কাল্লু ওর পড়ে থাকা ব্যাগটার কাছে গেল দড়ি আনতে। আমিও বসে না থেকে আব্বাসের দেহ তল্লাশি শুরু করলাম। কিছুক্ষণ খুঁজতেই ওর প্যান্টের পকেটে একটা ছুড়ির সন্ধান পেলাম। বিশাল ফলাযুক্ত ছুড়ি না হলেও কাউকে জখম করার জন্য যথেষ্ট, ধারও প্রচুর। ছুড়িটা তুলে নিজের প্যান্টের ডান পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। এরপর হাত বাড়ালাম মেঝেতে পড়ে থাকা পিস্তলটার দিকে। পিস্তলটা হাতে তুলেই হতাশ হতে হলো। এটা কাল্লুর সেই নকল পিস্তলটা। ভুয়া পিস্তলটা দিয়ে আমাকে এতক্ষণ আব্বাস ভয় দেখিয়েছে ভাবতেই নিজের উপর চাপা ক্ষোভ হলো। আসলেই আমি কী বোকা! কিন্তু কী-ই বা করবো, আসল নকল না জেনে ঝুঁকি নেয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হতো না। তাছাড়া আব্বাস যতটা দূরে দাঁড়িয়েছিল তত দূর থেকে আসল নকল যাচাই করা সম্ভব ছিল না।

এসব ভাবতে ভাবতেই দেখলাম কাল্লু দড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে। দুজনে মিলে খুব শক্ত করে আব্বাসকে বেঁধে ফেললাম। তারপর পকেট থেকে রুমালটা বের করে সেটাতে কিছুটা ক্লোরোফর্ম ঢেলে আব্বাসের নাকের উপর চেপে ধরলাম। এবারে ও আর সহসা জেগে উঠবে না। নিশ্চিত হয়ে আমি আর কাল্লু মিলে ধরাধরি করে ওকে এক কোনায় নিয়ে রাখলাম, যাতে ঢুকেই কেউ ওকে দেখতে না পায়।

অবশেষে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলাম।

১২

সময়: রাত ০৮:০৯

কাল্লুকে সাথে নিয়ে এখনও রান্নাঘরের ভেতরেই আছি। দুজনে বসে পরবর্তি কাজগুলো পরিকল্পনায় ফেলার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, রঞ্জন আর শুমেলের কি এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে? হয়তোবা এসেছে। ধারণা করা মুশকিল, যদিও প্রায় চার ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু ওরা যেভাবে বুভুক্ষের মতো শিঙ্গারাগুলো খেয়েছিল তাতে এতক্ষণে জ্ঞান না এলেও অবাক হবার কিছু নেই।

স্পষ্ট মনে আছে, ক্লোরোফর্ম যখন একদম প্রথম আমরা ব্যবহার শুরু করি, তার আগে পরীক্ষামূলকভাবে সেটা শুমেলকে শোঁকানো হয়েছিল। ও পাক্কা আট ঘন্টা অজ্ঞান ছিল তাতে। রঞ্জনের মধ্যে সেরকম ঘুমের বাতিক নেই, তবে ওষুধ বলে কথা, কোনও নিশ্চয়তা নেই তাই ওকে নিয়েও।

আমাকে চুপচাপ বসে ভাবতে দেখে কাল্লুই প্রথমে কথা বলল, "তাইলে কি করবি, কিছু ঠিক করলি?"

মাথার অবিন্যস্ত চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, "নাহ, ভাবছি।"

"কী ভাবিস অত? গিয়া দুইটারে ধইরা মাইর দিলেই তো হয়।" রাগে গজগজ করল কাল্লু।

"এত রাগ ভাল না, মাথা ঠাণ্ডা কর। বড় তো ওই খেলনা পিস্তল একটা আমাদের কাছে, ওদের দুজনের কাছেই একটা করে আসল পিস্তল আছে। সুতরাং, বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে," বিরক্তির সাথে বললাম।

কাল্লু বলল, "তাড়াতাড়ি কিছু ভাল বুদ্ধি বাইর কর, পরে ওরা পালাইয়া গেলে তখন আর বুদ্ধি দিয়া কোনও কাম হইবে না।"

সেটা আমিও বুঝতে পারছি, ওরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে করে ফেলেছে। তবে ফিরোজ আমার উপর একটা বদলা নিতে চায়, সুতরাং, সে হয়তো কিছুটা দেরি করবে আমাকে ধরার জন্য। এটাই এখন একমাত্র ভরসা। ফিরোজ খুবই চতুর লোক, তাই এভাবে সে হয়তো নাও ভাবতে পারে। অর্থের খাতিরে বদলার চিন্তাটা ছেড়েও দিতে পারে। এ ধরনের মানুষ কখন যে কী করবে বলা যায় না।

আমার বুদ্ধি দিয়ে ফিরোজের বুদ্ধির সাথে পাল্লা দিতে যাওয়া ঠিক হবে না, এর জন্য দরকার রঞ্জনকে। যেভাবেই হোক ওকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি যতগুলো ঘর ঘুরে দেখেছি তার কোনটাতেই ওদের নাম গন্ধও পাইনি।

আচমকা মনে পড়ল, শুধু আমি না, কাল্লুও বাড়িটা ঘুরে দেখেছে। ওকে এই

BanglaBook.org

বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা তুই তো অনেকক্ষণ আগে বাড়িতে ঢুকেছিস, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? বস কিংবা শুমেলকে কোথাও দেখিসনি?"

"আমিতো দেখি নাই। পিছনের দরজা দিয়া প্রথমে ঢুকলাম। এর পরে অনেকটা হাইটা সরু গলি ধইরা একটা বড় ঘরের মইধ্যে পড়লাম। সেইখানে দ্যাখলাম ক্যামেরা ফিট কইরা রাখছে। আমি পাশ কাটাইয়া আরও কয়েকটা ঘর ঘুইরা দেখলাম, তারপর একটা সিঁড়ি পাইয়া গেলাম। সিঁড়ি দিয়া উপরে আসলাম। শুমেল আর বস যেই ঘরের কথা কইছিল ওই ঘর খুঁইজা পাইলাম। সেই খানে কেউ ছিল না," বলল কাল্লু।

অধৈর্য হয়ে বললাম, "এরপর তুই রাহাতের সাথে যোগাযোগ করলি, আর সিঁড়ি দিয়ে আরও উপরে উঠলি। তারপর?"

কাল্লু না বোধকভাবে মাথা নাড়ল। "আরে না না, উপরে উঠি নাই তো!"

অবাক হলাম, "উপরে উঠিস নি! কেন উঠিস নি? আমি তোর জন্য অপেক্ষা করে ছিলাম!"

এবারে ক্ষেপে গেল ও। "অপেক্ষা করতে ছিলি মানে! তুই কথা কস নাই ক্যান? কথা কইলে কি তোর মুখে ঠোস পড়ত?"

ওর মুর্খামি দেখে ইচ্ছে করছিল এক চড় বসিয়ে দিতে, কিন্তু অসম শক্তির কথা ভেবে নিজেকে সামলে নিলাম। ঠাণ্ডা মাথায় বললাম, "আরে আমি কিছু বললে ফিরোজ শুনে ফেলার সম্ভাবনা ছিল, তাই বলিনি। ওই সময় আমার হাত খাটের সাথে বাঁধা ছিল হাতকড়া দিয়ে, ফিরোজ যদি কিছু সন্দেহ করে চলে আসতো তা হলে বিপদে পড়তাম।"

হাতে লেগে থাকা হাতকড়ার অবশিষ্ট অংশটা কাল্লুকে দেখালাম।

সেটা দেখে ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। অবাক হয়ে বলল, "আইব্বাপ! তর এই অবস্থা কে করল?"

ওকে রিহার সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। সব শুনে চোখ কপালে তুলল কাল্লু, "সর্বনাশ, সাংঘাতিক মাইয়া! ভাল বাঁচা বাইচা গেছিস আইজকা।"

ভাল বাঁচা এখনও বাঁচতে পারি নি। এখান থেকে যতক্ষণে না অক্ষত বের হতে পারছি, ততক্ষণে বেঁচে গিয়েছি এটা বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাই না।

আমি গুরুত্ব সহকারে কাল্লুকে বললাম, "ওসব বাদ দে। তুই সিঁড়ি দিয়ে তিন তলাতে না উঠে কই গিয়েছিলি সেটা বল।"

কাল্লু মুখ ছোট করে বলল, "যাইতে আর পারলাম কই! যাইতে চাইছিলাম, কিন্তু পারি নাই, দরজা বন্ধ আছিল। পরে কে যেন উপর থেইকা নামতাছে শুইনা আবার নিচে নাইমা আসছি। দুই তলার ঘর গুলাতে খুঁজছি বস আর শুমেলরে, পাই নাই। তয় রান্নাঘর পাইয়া গেলাম, ভাবলাম আগে কিছু খাইয়া নিই, পরে তিন

BanglaBook.org

তলায় যামু আবার। যেই খাইতে গেলাম, অমনি মাথার পিছনে বাড়ি, বুঝলি তো, নাকি?!"

বুঝলাম। খাওয়ার লোভ আমিই ছাড়তে পারি নি, আর ও তো কাল্লু। কিন্তু ভাববার বিষয় হচ্ছে ও সিঁড়ি দিয়ে ঠিক কোথায় যেতে চাচ্ছিল।

সরাসরি প্রশ্ন করলাম, "তুই কোথায় যেতে চাইছিলি?"

কাল্লু রহস্যময়ভাবে বলল, "আছে, দোতলা আর তিনতালার মাঝে একটা ঘর আছে। দোতলা থেইকা তিন তালাতে উঠার সিঁড়ি দিয়াই যাইতে হয় ওই ঘরে।"

আকাশ থেকে পড়লাম, এ রকম একটা ঘর আমার চোখে কেন পড়ল না! তারপরে মনে এল ওই সময় আমি রিহার থেকে লুকিয়ে রুমালে ক্লোরোফর্ম ঢালায় ব্যস্ত ছিলাম, সেজন্যই হয়তো চোখে পড়েনি। কিন্তু, যখন নামছিলাম তখন তো চোখে পড়তে পারতো? হয়তো, পেছনে তাড়া খেয়ে ব্যস্ত ছিলাম সেজন্য চোখে পড়েনি! কে জানে কেন চোখে পড়েনি, এটা নিয়ে এত ভেবে লাভ নেই, তার উপরে ওই ঘরটা কোনও প্রকার গুরুত্ব বহন করে কি না সেটাও যথেষ্ট প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার।

আমাকে চুপ চাপ ভাবতে দেখে কাল্লু বলল, "চল আগে ওই ঘরটাই ঘুইরা আসি। তুই চেষ্টা করলে হয়তো পারবি তালাটা খুলতে।"

এর থেকে ভাল কোনও বুদ্ধি আমার কাছেও নেই এই মুহূর্তে। কাল্লু নিচে আর উপরের কিছু ঘর ঘুরে দেখেছে, আমিও তিন তলাতে আর দোতালাতে অনেকগুলো ঘরেই ঢুকেছি, সুতরাং ওটাও বাদ দেয়ার কোনও মানেই হয় না। তার উপরে দোতলা আর তিনতলার মাঝামাঝি একটা ঘর, ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কাল্লুকে বললাম, "চল, দেরি করে লাভ নেই। আগে দেখি ওখানে কিছু আছে কি না। না পেলে তখন অন্য কিছু ভাবা যাবে।"

ও যেন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল, আমার কথা শুনে ফট করে উঠে দাঁড়াল। দুজনে বেরুবার আগে রান্নাঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

বাইরে মাথা নিয়ে এদিক ওদিক দেখে বেরিয়ে এলাম, আমার পেছন পেছন কাল্লুও এল। কিছুক্ষণ আগেও একদম একা ছিলাম, এখন আর সেই অবস্থা নেই। কাল্লু থাকায় ইতিমধ্যে কিছুটা ভরসা পেতে শুরু করেছি।

চুপি চুপি হেঁটে সিঁড়ি ঘরের দরজাটার কাছে চলে এলাম। দরজা খুলতে যাব অমনি কাল্লু বলে উঠল, "আরে না না এইটা না, আরও সামনে যাইতে হবে।"

দরজা থেকে সরে গেলাম, "ঠিক আছে, তুই আগে যা, আমি পেছনে আছি।"

কাল্লু সামনে এগিয়ে চলল, কোনও থামাথামি নেই। করিডোরে দুই-একটা ক্যামেরা অলসভাবে এদিক ওদিক ঘুরছিল, কিন্তু ওগুলো এড়ানো এখন আর সম্ভব না। তবে বুঝলাম কীভাবে ফিরোজ আর জলিল কাল্লুকে দোতলায় ঘুরতে দেখেছে।

BanglaBook.org

সম্ভবত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করলে আমরা যে মাঝামাঝির ঘরটাতে যাব সেটা বুঝতে ওদের কিছুটা সময় লাগবে, ওটাই ভরসা। কাল্লু ঘোরানো পথ ধরে পা চালাল। বেশ কিছুক্ষন পর নিজেকে অন্য একটা দরজার সামনে আবিষ্কার করলাম। দরজাটা ঠিক সিঁড়ি ঘরের দরজার মতই দেখতে। বুঝলাম, কাল্লু এবার এটা দিয়েই ঢুকবে।

অবশেষে কাল্লু আমার ধারণা মতই দরজাটা খুলে ফেলল। দু'জনে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সম্ভবত এই দরজাটা তিন তলাতে ওঠার অপর দরজাটার ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত। দরজার ওপাশে যে সিঁড়িটা দেখা গেল সেটাও ভিন্ন ধরনের। অপর পাশের সিঁড়িগুলোর মতো সোজা উপরে উঠে না গিয়ে আঁকা-বাঁকাভাবে উঠেছে। দেখলাম সেই বাঁকের একটা মাথাই গিয়ে মিশেছে দোতলার মাঝামাঝি ছোট্ট দরজারটার সাথে। ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

দরজায় কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম, ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না। কাল্লু তাড়া দিলো, "আরে ধুর, কান লাগাইয়া আবার কী শুনিস, তাড়াতাড়ি কর, নাইলে আবার সমস্যা হইতে পারে কেউ চইলা আসলে!"

ওর দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে অতঃপর কাজে নেমে পড়লাম। কঠিন লক। খোলা যদিও অসম্ভব কিছুই না, তবে যথার্থ ধৈর্যের প্রয়োজন। এমন তালা আগেও খুলেছি। অতঃপর ব্যাগ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস বের করে কাজে নেমে পড়লাম। প্রায় মিনিট দশেক ধরে বিভিন্ন চেষ্টা পরেও লক আয়ত্তে এল না।

কাল্লু খোঁচা দিয়ে বলল, "কী-রে, আমি তো ভাবতাম তুই লক খুলায় ওস্তাদ, এখন দেখতাছি কিছুই পারস না!"

সারা শরীর রি রি করে জ্বলে উঠল, ক্ষমতা থাকলে ওকে এখনই পাথর বানিয়ে দিতাম। ফাজিলটা নিজে পারে না, আবার আমাকে খোঁচাচ্ছে।

সহসাই মনে পড়ল আমার কাছে রিহ্যর সেই চাবির গোছাটা রয়েছে, সেটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখলেই হয়! প্যান্টের পকেট থেকে চাবির গোছাটা বের করতেই কাল্লু হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এইটা কী হইল?"

হাসতে হাসতে বললাম, "কেন? কী হলো আবার?"

"তুই চাবি পাইলি কই?" অবাক হয়ে বলল কাল্লু।

"পেয়েছি, তোর মতো গবেট তো না, তাই পেয়েছি। এ আর এমন কী!" দায়সারা জবাব দিলাম।

শুনে, ও তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। গর্জন দিয়ে বলল, "দ্যাখ হিরন, অযথা ফাইজলামি করবি না কইলাম। এইসব কিন্তু আমার একদম পছন্দ না।"

লকের মধ্যে চাবিগুলো একের পর এক ঢুকিয়ে চেষ্টা করে চললাম।

BanglaBook.org

কোনটাতেই কাজ হলো না। আমার অস্থির অবস্থা দেখে কাল্লু খুব মজা পেল। ও আবার খোঁচা দিয়ে বলল, "কি-রে বুদ্ধিমান, চালাকি কইরা ভুল চাবি নিয়া আসছিস নাকি?"

ওর কথা গায়ে মাখলাম না, একের পর এক সবগুলো চাবি চেষ্টা করে গেলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরজা খুলল না। অগত্যা আবার আদি পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি দিয়ে দরজা খুলতে বসে গেলাম। দুর্দশা দেখে কাল্লু এই অস্থিরতার মধ্যেও ব্যাপক মজা পেল।

অবশেষে আরও পনেরো মিনিট কঠোর সংগ্রামের পর কাল্লুর দিকে ফিরে বিজয়ীর হাসি হাসলাম, "নে, খুলেছে তোর লক, এখন দরজা খুলে আমাকে ধন্য কর।"

কাল্লু যেন আগে থেকেই জানতো লকটা যেভাবেই হোক আমি খুলে ফেলব। সে কোনও রকম আবেগ না দেখিয়ে দরজার হাতলে মোচড় দিল। সাথে সাথে দরজা খুলে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরের ভিতরে হনহনিয়ে হেঁটে গেল ও। মোবাইল বের করে টর্চটা জ্বালালাম। আলো জ্বলে উঠতেই দেখলাম কাল্লু একটা বড় গর্তের একদম শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছে।

চিৎকার দিলাম, "দাঁড়া!"

কাল্লুর ডান পা-টা গর্তের ঠিক উপরে থেমে গেল। ততক্ষণে দৌড়ে ভেতরে পৌছে গেছি। কাল্লুও এবার দেখতে পেল গর্তটা। ও আতংকের সাথে বলল, "সারছে! এত্ত বড় গুহা এইখানে কোথা থেইকা আইল?"

ওর কথার জবাব না দিয়ে আলো ফেলে গর্তের গভিরতা মাপার চেষ্টা করলাম। কাল্লু বুকে থুথু ছেটাতে ছেটাতে বলল, "যা বাঁচান বাঁচাইয়া দিলি! আরেকটু হইলেই মরছিলাম!"

ওর সারা শরীর মুহূর্তেই ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

আবারও ওর কথার কোনও প্রত্যুতর না দিয়ে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, এই গর্ত কতটা গভির হতে পারে?"

শরীরের ঘাম হাতের পেছন দিয়ে মুছতে মুছতে কাল্লু বিরক্তির সাথে বলল, "আমি কি এই বাড়ি বানাইছি নাকি? কত গভির ক্যামনে কমু?"

সেটাও ঠিক, ও-ই বা কীভাবে বলবে। তার থেকে পরীক্ষা করে দেখাই ভাল। গেঞ্জির বামদিকের বুকপকেট থেকে একটা কলম বের করে সেটা গর্তের উপর ছেড়ে দিলাম। কলমটা পড়তে পড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও আওয়াজ শোনা গেল না।

আমি আর কাল্লু, দুজনে দুজনের মুখের দিকে হতাশভাবে তাকালাম।

ঘরের চারিদিকটা ভাল করে আলো ফেলে দেখার চেষ্টা করলাম অগত্যা।

BanglaBook.org

সেখান কিছুই নেই। আসলে এটাকে একটা ঘর বলাও ভুল, জায়গাটা ছোট্ট খুপরির মতো, যার মাঝখানে একটা বড় গর্ত ছাড়া আর কিছুই নেই। গর্তের মুখটা গোল, সুন্দর লাল ইট দিয়ে বাঁধাই করা। আরও ভাল মতো লক্ষ্য করে দেখলাম গর্তের মুখের সাথে একটা লম্বা লোহার মই ঠিক নিচের দিকে নেমেছে। এতক্ষণে কাল্লুও প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠে সেটা দেখতে পেয়েছে। ও সংকোচের সাথে বলল, "কী-রে, নাইমা দেখলে কেমন হয়?"

মনে মনে জানতাম, আপাতত এটা দিয়ে নামা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ যদি ফিরোজরা আমাদের দেখে ফেলে থাকে তাহলে এখানে চলে আসতে পারে যে কোনও সময়ে।

কাল্লুকে বললাম, "হুম, নামতে তো হবেই, তবে তার আগে কিছু কাজ আছে।"

ওকে সিঁড়ির সামনে রেখে আবার দরজার কাছে ফিরে গেলাম। এখন এটাকে ভেতর থেকে বন্ধের একটা ব্যবস্থা করতে, হবে যাতে ফিরোজরা এসে গেলেও হুট করে ঢুকে পড়তে না পারে।

লকের মুখটা পকেটে থাকা কিছু টুল ব্যবহার করে এপাশ থেকেই জ্যাম করে দিলাম। এখন এই দরজা একমাত্র ভেঙেই খোলা সম্ভব, অথবা ঘরের ভেতর থেকে খোলা যাবে।

দরজার বন্দোবস্ত করে ফিরে এসে কাল্লুকে বললাম, "চল, আর দেরি করে কাজ নেই।"

কাল্লু চোখ পাকাল। "দেরি কে করলো, তুই না আমি?"

"আমি করেছি দেরি। তুই এসব বাদ দিয়ে ওই সিঁড়ি ধরে নামা শুরু কর।" মেনে নিলাম, ঝগড়া করে কাজ নেই।

বেঁকে বসল ও। "না আমি আগে নামব না, তুই আগে নাম।" সাফ জানিয়ে দিলো।

এবারে ওকে কথার খোঁচা দিলাম, "কি-রে ভয় পাচ্ছিস নাকি?"

"না না ভয় কেন পাব! তুই নাম আগে, আমি পেছনেই আছি," থেমে থেমে বলল কাল্লু।

কথা না বাড়িয়ে নিচে নামতে শুরু করলাম। কাল্লুও ঠিক মাথার উপরেই একটা করে পা নিচে নামাচ্ছিল। সিঁড়িটা বেশ বিপজ্জনক, মাঝে মধ্যে পা পিছলে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে সামলে নিলাম প্রতিবার। সমস্যা হচ্ছে, যদি কাল্লুর পা পিছলে যায়, আর ও সামলাতে না পারে, তা হলে দুজনেই একসাথে গর্তের নিচে গিয়ে পড়ব। তখন ও যদি আমার উপর পড়ে তা হলে হাত পা ভেঙে বেঁচে যেতেও পারে। তবে, আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

BanglaBook.org

জায়গাটাকে গর্ত না বলে একটা নিম্নমুখি সুড়ঙ্গ বলাই বোধহয় বেশি যুক্তিযুক্ত। সুড়ঙ্গের দেয়াল লাল ইট দিয়ে বাঁধাই করা। সেখানে যদিও কোনও চিত্রকর্ম কিংবা খোদাই শিল্প নেই। সেগুলোর এখানে প্রয়োজনও নেই! এই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে কে-ই বা আসবে শিল্পের বিচার করতে? একজন শিল্পীর বাড়িতে এই ধরনের একটা সুড়ঙ্গ থাকার ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক। সুড়ঙ্গের শেষে আবার কোন বিপদ লুকিয়ে আছে কে জানে! সেসব ভেবে পেছানোর উপায় নেই, এখন শুধুই সামনে চলতে হবে, পৌছতে হবে এক অজানা গন্তব্যে।

কতক্ষণ ধরে নামছি তা ঠিক মনে নেই, হাতদুটো একরকম অবশ হয়ে এসেছে। মানুষ যখন অজানা লক্ষ্য নিয়ে কোনও কাজ করে তখন সময়ের হিসাব রেখে চলতে পারে না। অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ চলে গেলেও মনে হয় যেন বেশি সময় পার হয়নি। কখনও কখনও খুব অল্প সময় গেলেও মনে হয় যেন অনেকটা সময় চলে গিয়েছে।

সামনে চোখ রেখে নিচে পা ফেলতে ফেলতে কাল্লুকে বললাম, "তোর হাত ব্যথা করছে না তো?"

কাল্লু সশব্দে ফিচলে হাসি হাসল। "আমি কী তর মতো কোল্ড ড্রিংক খাওয়া পাবলিক নাকি যে ব্যথা হইবো?"

ফাজলামিটা গায়ে মেখে নিলাম। একমাত্র ভরসা যে লোকটি দিতে পারে তার সাথে ঝামেলা করে কোনও লাভ নেই। তার থেকে এই দুঃসহ মুহূর্তে সে যদি কিছুটা আনন্দ পায়, তাতে ক্ষতি কী? মানব জীবন ক্ষণস্থায়ি, তাই ক্ষণিকের আনন্দ সেই ক্ষণেই উপভোগ করে নেয়া ভাল।

অবশেষে পা মাটিতে এসে ঠেকল। হাত পা ছড়িয়ে শক্ত মার্বেল পাথরের তৈরি মেঝেতে বসে পড়লাম। এরকম একটা সুড়ঙ্গের নিচে মার্বেল পাথরের মেঝে! ব্যাপারটা হজম হচ্ছিল না। বাড়িটা ক্রমেই যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠছে।

কাল্লুও অবশেষে মাটিতে পা রাখল।

ও বিরক্তির সুরে বলল, "এইটা আবার কোথায় আইলাম? আজব কাহিনী! শালার, ঝামেলার শ্যাষ নাই! ওই হিরণ, কই যামু?"

টর্চের আলোটা ওর মুখের উপর ফেললাম। চোখ বুজল কাল্লু।

সোজাসুজি বললাম, "কোথায় যাবো আমি কী জানি! তুই এখানে আসতে চাইলি তাই এসেছি, না হলে আমি তো জায়গাটার কথাই জানতাম না। এখন সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইলে হবে না।"

বিপদে পড়লে দোষ অন্যের ঘাড়ের উপর চাপানো হচ্ছে মানুষের স্বভাবগত ত্রুটি। সঠিক কথা বলছি সেটা কাল্লু নিজেও জানে। তাই আমার মন্তব্যের পিঠে কোনও ফিরতি উক্তি না করে চুপ মেরে রইল।

BanglaBook.org

নিরবতা অসহ্য লাগল। অসহায়ভাবে মেঝেতে বসেই টর্চের আলোটা সামনের দিকে ফেললাম। সেই আলোয় একটা সরু পথ দৃশ্যমান হলো। কাল্লুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেও হা করে পথটা দেখছে। দাঁড়িয়ে প্যান্টের পেছনেটা হাত দিয়ে ঝেড়ে নিলাম।

কাল্লুকে বললাম, "মুখ বন্ধ কর, ভেতরে মাছি ঢুকে যেতে পারে। চল, দেখি ওদিকটায় কী আছে।"

কাল্লু নিজের অজান্তেই খুলে যাওয়া মুখটা বন্ধ করে বলল, "চল।"

দুজনে রাস্তাটায় পা বাড়ালাম। সেটা মাঝে মধ্যেই এদিক ওদিক বেঁকে যাচ্ছিলো, তারপরে আবার কিছুটা সোজা এগুচ্ছিল। যতটা পথ আমরা হেঁটেছি তাতে এতক্ষণে বারেক কালিয়ানের প্রাচীরের বাইরেও চলে গেলে অবাক হবার কিছু নেই। এক দিক থেকে দেখতে গেলে সেটাই ভাল হবে।

কথায় আছে, *'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'*

আপাতত বাপের নাম নিতে না চাইলেও নিজে বাঁচার প্রলোভনটা একদম ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। সমস্যা অবশ্য অন্য জায়গাতে, রাস্তাটা খুবই ঘোরপ্যাঁচের। যেমন আঁকা বাকা হচ্ছে, তাতে আমরা ঠিক এক জায়গাতেই বার বার ঘুরপাক খাচ্ছি কি না সেটাও বোঝা যাচ্ছে না।

কাল্লু অধৈর্য হয়ে বলল, "আরি, আর কত যাইতে হইবে? আর ভাল্লাগে না, কেমন দম বন্ধ হইয়া আসতাছে!"

আমারও ওর মতই মনে হচ্ছে, কিন্তু তবুও আগের খোঁচাটার বদলা নিতে ছাড়লাম না। বললাম, "কেন, তোর হার্ড ড্রিংক খাওয়া শরীর আর চাপ নিতে পারছে না বুঝি?"

শুনেই কাল্লু রাগে শরীরে কিছুটা বল পেল, আমাকে শাসিয়ে বলল, "ওই দ্যাখ হিরণ, বেশি ফট ফট করবি না। এমনিতেই কিন্তু মাথা গরম আছে কইলাম, এরপর কিছু একটা কইরা ফেললে, আমারে দোষ দিতে পারবি না।"

কাল্লুর ধমক শুনে চুপ হয়ে গেলাম। পরে রঞ্জনের উপস্থিতিতে ওকে যত ইচ্ছে কটাক্ষ করা যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

আরও কিছুক্ষণ বিভ্রান্তভাবে হাঁটার পরে অবশেষে আমরা সরু পথের শেষ মাথাতে এসে পৌছাতে পারলাম। সেখানে এসেই ফের হতাশ হতে হলো। আবিষ্কার করলাম শেষ মাথাতে কোনও দরজা নেই। যদিও সকাল থেকে দরজা খুলতে আর বন্ধ করতে করতে আমি ক্লান্ত কিন্তু এই কানাগলি দেখে অসহায় লাগল।

কাল্লু একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলল, "ধুর শালা, কোনও দরজা নাই! এখন কী করুম? ক্যামনে বাইর হমু?"

যথাসম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করলাম, এক সাথে দুজন হতাশ হয়ে গেলে

BanglaBook.org

সমস্যা। কোনও না কোনও রাস্তা নিশ্চয়ই আছে, আর যদি শেষ পর্যন্ত কিছুই না পাওয়া যায়, তা হলে আবার সেই সিঁড়ির কাছে ফিরে যেতে হবে। তবে সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য যে শক্তি আর উদ্যম প্রয়োজন সেটা নেই। কাল্লুরও একই অবস্থা। মানুষের মনস্তত্ত্ব অনেক জটিল প্রক্রিয়ায় কাজ করে, সবকিছুর বিচার শারীরিক শক্তির সাপেক্ষে করা যায় না, করা উচিতও না।

শান্তভাবে বললাম, "এত সহজেই অধৈর্য হয়ে গেলে চলবে?"

এরপরে ওকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে দেয়ালে হাত মুঠো করে আস্তে আস্তে বাড়ি দিলাম বিভিন্ন জায়গাতে। হাতে যে অনুভূতি পেলাম তাতে মনে হলো দেয়ালটা ফাঁপা। এই কথা কাল্লুকে জানাতেই ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। আমি আশেপাশের দেয়াল ধরে খুঁজে চললাম। গল্প-সিনেমাতে দেখা যায়, এরকম চোরা গুপ্ত দেয়াল খুলে ফেলার জন্য বিশেষ বোতাম থাকে, হয়তো এখানেও সেরকম কিছু একটা আছে। কিন্তু প্রায় আধা ঘন্টা ধরে তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরেও কিছুই পেলাম না। আবার হতাশা জেঁকে ধরল।

কাল্লু প্রত্যাশার চাপ সহ্য করতে না পেরে আরও আগেই মাটিতে বসে পড়েছে। ও এই সপ্তম বারের মতো জিজ্ঞেস করলো, "কি-রে, কিছু বাইর হইল নাকি উপায়?"

আমিও এই সপ্তম বারের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলাম, "না!" তারপর ওর পাশে মেঝেতে বসে পড়লাম।

আমাকে বিমর্ষভাবে বসে পড়তে দেখে কাল্লু বলল, "একটা ঠ্যালা দিয়া দেখুম নাকি?"

"মনে চাইলে দ্যাখ," দায়সারাভাবে বললাম।

মেঝের উপর হাতে ভর দিয়ে নিজের ক্লান্ত হয়ে যাওয়া শরীরটাকে কোনওভাবে সোজা করে দেখলাম কাল্লু উঠে দাঁড়াল। তারপর দেয়ালের উপর সজোরে ধাক্কা দিলো। দেয়ালটা একটু নড়ে উঠল, এছাড়া কিচ্ছু হলো না। আরও কয়েকবার ধাক্কা দিলো ও, দেয়াল অনড়।

কাল্লু পেছন ফিরে আমার হতাশ চেহারার দিকে তাকিয়ে আবার দেয়ালের দিকে মুখ করল। এবারে প্রাণপণে দেয়ালটা ঠেলতে শুরু করল। তবুও কোনও পরিবর্তন নেই। তবে, আমার ডান তালুর নিচের মার্বেল পাথরের একটা অংশ উঁচু হয়ে উঠেছে টের পেলাম। মোবাইলের লাইটটা ঘুরিয়ে পাথরটার উপর ফেললাম। দেখলাম, সত্যিই সেখানে চারকোনা একটা অংশ উঁচু হয়ে উঠেছে!

দেয়ালের উপর থেকে আলো সরে যেতেই কাল্লু বিরক্ত হয়ে বলল, "আলোটা সরাইয়া নিলি ক্যান?"

দেখলাম, উঁচু হয়ে থাকা পাথরটা সহসাই আবার মেঝের সাথে মিশে গেছে।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

কাল্লুকে নির্দেশ দিলাম, "তুই দেয়ালে এখনই ধাক্কা দে, আরও জোরে ধাক্কা দে।"

কাল্লু হকচকিয়ে গেল। কিন্তু, আমার গলায় যে জোর ছিল তাতে নির্দেশ অমান্য করতে পারল না। সর্বশক্তি দিয়ে আবার দেয়ালটা ঠেলা শুরু করল। পাথরটা ফের উপরে উঠে এল। চারপাশে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলাম। অবশেষে এক পাশে একটা খাঁজের মতো পেয়ে গেলাম। দেরি না করে খাঁজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে জোরে টান দিলাম। টান খেয়ে সেটা আরও একটু উপরে উঠে এল, কিন্তু দেয়ালে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। এবারে পাথরটা ঘুরাতে চাইলাম, সেটা ঘুরতে শুরু করল আস্তে আস্তে। পাথরটা ঘুরে পুরো উল্টো দিকে এসে থামল। দেখলাম এখনও দেয়াল আগের মতই আছে আর কাল্লু প্রানপনে ঠেলে চলেছে সেখানে। আরও কিছুক্ষণ পাথরটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করলাম, কিন্তু দেয়ালের গুপ্ত দরজাটা খোলার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে পাথরটার উপর জোরে লাথি কষলাম।

লাথি খেয়ে ওটা খাঁজটার মধ্যে বসে পড়ল। সাথে সাথেই ঘরঘর শব্দে সুড়ঙ্গের সামনের দেয়ালটা প্রথমেই কিছুটা ভেতরে এগিয়ে গেল। তারপর বাম পাশে ক্রমশ সরে চলল। আচমকা কম্পনের ফলে কাল্লু কিছুটা বেসামাল হয়ে দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল, আমি ঝট করে ধরে ওর মেঝেতে পড়ে যাওয়াটা আটকালাম।

দেয়ালটা সম্পূর্ণভাবে সরে যেতেই আমাদের সামনে একটা আলোকোজ্জ্বল কক্ষ আত্মপ্রকাশ করল।

১৩

সময়: রাত ০৯:৩৮

উত্তেজনার ফাঁকে কখন যে অনেকটা সময় চলে গেছে টেরও পাইনি। উত্তেজনা ব্যাপারটাই এমন, একবার শুরু হয়ে গেলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত হুঁশ আসে না। এতক্ষণে একটা আশার আলো দেখছিলাম। শুধু আশার আলোই না, সেই সাথে সামনের ঘর থেকে ঠিকরে বেরুনো টিউব লাইটের আলোও। আচমকা বাঁধ ভাঙা আলোয় আমাদের দুজনেরই চোখ বুজে আসতে চাইল। অনেক কষ্ট করে চোখ মেলে রইলাম।

ঘরটা যে কোনও সাধারণ ঘর না সেটা ভেতরে পা রেখেই বুঝলাম। সমস্ত মেঝে সুদৃশ্য কার্পেট দিয়ে মোড়ানো। অত্যাধুনিক সব জিনিসপত্রে ঠাসা জায়গাটা। একপাশের বিশাল দেয়ালে অসংখ্য মনিটরের ডিস্‌প্লেতে বিভিন্ন ঘরের ছবি ফুটে উঠেছে। অবাক হয়ে দেখলাম সেখানে বারেক কালিয়ানের বাড়ির বেশ কিছু ঘর সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। শুধু যেগুলোতে কোনও ক্যামেরা খুঁজে পাইনি সেগুলো সেখানে দেখা গেল না। ডিস্‌প্লেগুলোর নিচে একটা বিশাল টেবিলের মতো বড় কন্ট্রোল বোর্ড পাতা। সেখানে হরেক রকমের বোতাম। সেগুলোর কোনটা দিয়ে কী হয় প্রকৃত প্রশিক্ষণ না থাকলে তা বোঝার ক্ষমতা কারও আছে বলে মনে হয় না।

তা হলে কি এটাই সেই ঘর যেখানে বসে এতক্ষণ ফিরোজ সবকিছুর উপরে নজর রাখছিল? যদি সেটাই হয়ে থাকে, সে এখন কোথায়?

ফিরোজের অনুপস্থিতি মনে স্বস্তি এনে দিলো।

ভেতরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই পেছন থেকে একটা বড় বুকশেলফ সরে গিয়ে দেয়ালের ফাঁকাটা আটকে ফেলল। বুঝলাম এটা দিয়ে দেয়ালের নকলটা বানানো হয়েছিল। তা মন্দ বানায়নি, আরও একবার শিল্পীকে উন্নত রুচির জন্য প্রশংসা করতে হলো।

ঘরে পেতে রাখা একটা মজবুত কাঠের চেয়ারের উপর বসে পড়তে পড়তে কাল্লু বলল, "আরি বাবা! এত কিছু করছে ক্যামনে? তেলেছমতি কারবার!"

ওর কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়লাম।

একপাশে ফ্রিজের দেখা পাওয়া গেল, তার সাথেই একটা ছোট্ট মাইক্রোওভেন, শর্ট সিংক; মানে ছোটো-খাটো কিচেনের মতো সাজানো।

এলোমেলো চেয়ারগুলো দেখে বুঝলাম এখানে কিছুক্ষণ আগেই কেউ এসেছিল।

ঘরের একপাশের দেয়াল ঘেঁসে একটা বড় সোফা আর সোফার পাশেই লাগানো আয়না। কক্ষের কেন্দ্রে ছোট্ট টি-টেবিল রাখা।

BanglaBook.org

একমাত্র দরজাটা মনিটরগুলোর ঠিক উল্টো দিকের দেয়ালে অবস্থিত। সেটার তেমন কোনও বিশেষত্ব নেই, কেবলমাত্র লকটা বেশ মজবুত।

কিছুক্ষণ সোফাতে বসে রইলাম। রঞ্জন কিংবা শুমেল এ ঘরে নেই, তবে এখানে এমন একটা জিনিস আছে যেটা ওদের খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে পারে। সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ঘরে লাগানো সেই অসংখ্য ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার থেকে ডিস্‌প্লেতে ভেসে আসা ছবিগুলো। সোফাতে হেলান দিয়ে বাম দিকের উপরের কোণা থেকে এক একটা মনিটরে চোখ রেখে চললাম। কোনও কোনও ঘরে আলো জ্বলছিল না, সেগুলোতে কিছুই দেখা গেল না। যেসব ঘরের আলো জ্বলছিলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও সেখানে রঞ্জন, শুমেল, রিহা, ফিরোজ কিংবা জলিল কারোই সন্ধান পেলাম না। হতাশ না হয়ে একে একে করিডোর, লন, বাগান, গ্যারেজের ভেতরে বাইরের ক্যামেরার থেকে আসা ছবিগুলোর দিকে নজর দিতে শুরু করলাম।

অন্যদিকে কাল্লু বেশ রিলাক্স মুডে হেঁটে চলল; ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে ওর কাণ্ড-কারখানা দেখছিলাম। ও প্রথমেই আয়নায় নিজের চুল ঠিক করলো, তারপর তিন দিন ধরে দাড়ি কাটা হয় না দেখে কিছুক্ষণ আফসোস করল। ফ্রিজ থেকে নিয়ে ঢক ঢক করে পুরো এক বোতল কোকা-কোলা গিলে ফেলল। সেটা শেষ হতেই ডিপ ফ্রিজ খুলে কী একটা আইসক্রিমের বাক্স বের করে সেখান থেকে খেয়ে চলল।

ওর কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক হয়ে বললাম, "ব্যাপার কী? আমি ওদের খুঁজে মরছি আর তুই দেখি খেয়েই কূল পাচ্ছিস না! একটু মনিটরগুলো দ্যাখ, কোথাও কিছু পাচ্ছিস কি না!"

আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কাল্লু দাঁত বের করলো, "আরে সেইসব পরে, আগে খাইয়া লই। তোর তাড়াহুড়ার ঠ্যালায় তখন রান্নাঘরে কিছু খাইতে পারি নাই। এখন না খাইলে মারামারি ক্যামনে করমু?"

আমি মনিটরের দিকে চোখ রেখেই বললাম, "মারামারি করতে হবে এটাই বা ধরে নিচ্ছিস কেন? এতক্ষণে তো ওরা সব মালপত্র নিয়ে পালিয়েও যেতে পারে!"

এবারে কাল্লু সশব্দে হাসল। "তাইলে তো ভালই হয়, আমরাও কাইটা পরুম, কাহিনী খতম।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর সাথে দর কষাকষির বিরতি টানলাম। যে বুঝতে চায় না তাকে অযথা বোঝানোর চেষ্টাই বৃথা, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। কাল্লু বেঁকে বসলে আমি একা কিছুই সামলাতে পারব না। আর রঞ্জন তো ওকে বুদ্ধির জন্য দলে রাখেনি, রেখেছে শক্তির জন্য। সময় মতো সঠিকভাবে শক্তির প্রয়োগ করতে পারলেই চলবে। তবে ওর ভেবে দেখা উচিৎ ছিল, আমি যদি ওর মতো করে ভাবতাম তাহলে এতক্ষণে টাকা-পয়সা বগলদাবা করে এই বাড়ি থেকে একাই ভেগে যেতে পারতাম। তখন ওকে বাঁচাতে কেউ আসত না। যদিও একটু আগে ও-ই

BanglaBook.org

আমাকে বাঁচিয়েছিল, তাও, আমি না গেলে ও রান্নাঘরের গোয়েন্দা পুলিশটার উপর এক হাত নেওয়ার সুযোগ পেত না। আমাকে ক্রেডিট দিতেই হবে।

আমি যে ব্যাগে ভরে অনেক টাকা নিয়ে এসেছি সেই কথাটা এখনও কাল্লুকে জানাইনি। টাকার লোভ খুব খারাপ, পরে যদি ওর মাথায় আমাকে মেরে টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবার ধান্দা থাকে তা হলে সেটা রুখতে পারব না। ভেবেছি সব কাজ শেষ হয়ে গেলে জানাব, বিপদ না থাকলে ওর মাথা বিগড়ানোরও সম্ভাবনা থাকবে না। তাছাড়া রঞ্জন ফেরত এলে কোনও চিন্তা নেই, কাল্লুকে কীভাবে সামাল দিতে হয় সেটা ও খুব ভাল করেই জানে।

নিখুঁতভাবে দেখার চেষ্টা করলাম, বাইরের মোটামুটি পুরোটাই অন্ধকার, গ্যারেজে লাগানো ক্যামেরা দিয়ে আবাছাভাবে গাড়িটা এখনও সেখানে দেখা যাচ্ছে। তার মানে ওরা পালানোর জন্য হয়তো এই গাড়িটার সাহায্য না নিয়ে অন্য কোনও উপায় বের করেছে। তা অবশ্য করতেই পারে, কিন্তু ছবিতো নেহাত কম নয়। মাইক্রোটা নেওয়ার কথা ভাবছে কি? বলাই বাহুল্য আর দশটা বড়লোকের মতোই বারেক কালিয়ানের গাড়ির সংখ্যা এক-এ সীমাবদ্ধ না। তবে ড্রাইভার সকালে যে গাড়িটা ড্রাইভ করছিলো সেটাই শিল্পী বেশি ব্যবহার করে থাকেন। গাড়িটা দামি দেখেই ছবি সরানোর সময় এই গাড়িটা নেওয়ার পরিকল্পনা আমাদের ছিল। বাড়িতে ঠিক কতগুলো ছবি পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে কোনও ধারণা ছিল না, থাকলে রঞ্জন হয়তো বড়সড় গাড়ি নেবার পরিকল্পনা করতো। এ বাড়ির ভেতরে ঢুকে নজরদারি চালানোর উপায় ছিল না, তাই বাইরে দেখেই ছক সাজাতে হয়েছিল। কাজটা ভুল হয়েছে। কিন্তু এ দেশেও এত সুরক্ষিত বাড়ি কেউ বানাতে পারে, ভাবাই যায় না!

কাল্লু এতক্ষণে আইসক্রিমের বাক্স হাতে একটা চেয়ার টেনে বসেছে, সেও মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন মনিটরের পর্দায় চোখ রাখছে।

প্যান্টের পকেটে সহসাই মোবাইলটা কেঁপে উঠল। অসময়ে কে ফোন করল আবার? এই ফোন নম্বর তো আমি কাউকে দেই না! এটা কেবলমাত্র কাজের সময় ব্যবহার করা হয়, নম্বরটা খুব কম লোকই জানে। মনিটরের পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে মোবাইলের দিকে মনোযোগ দিলাম, দেখা দরকার কে ফোন করেছে।

মোবাইল হাতে নিতেই দেখলাম নম্বরটা অচেনা। এই সময় কি অচেনা নম্বর থেকে আসা ফোন রিসিভ করা উচিৎ? সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আচ্ছা এমন কি হতে পারে, ফিরোজরা আমাকে খুঁজে বের করার জন্য ফোনটা করছে? তেমন হলে ফোন ধরা উচিৎ না।

লাইনটা কেটে দিলাম।

সাথে সাথেই ফোন আবার বেজে উঠল। এবারে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলো,

BanglaBook.org

এ নিশ্চয়ই ফিরোজ। এমন বুদ্ধি ও ছাড়া আর কারও মাথাতে আসতে পারে না। শয়তানটা খুবই চালাক! কিন্তু, ও-ই যদি হবে তাহলে বার বার আমাকে কেন ফোন করছে? কাল্লুকে কেন করছে না? পরে করবে কী?

আবার ফোনটা কেটে দিলাম। এমন সময় কাল্লু মুখ খুলল। "ওই, গ্যারাজের আলো তো জ্বইলা উঠল!" উত্তেজিত হয়ে বলল কাল্লু।

রুদ্ধশ্বাসে যে মনিটরের পর্দায় গ্যারাজটা দেখা যাচ্ছিল, সেখানে চোখ রাখলাম। সত্যিই সেখানে এখন আলো জ্বলে উঠেছে। ভেতরের সবকিছু মোটামুটিভাবে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তার মানে কি ওরা এখনই পালানোর চেষ্টা করছে? কাল্লু আমার দিকে তাকাল, সম্ভবত ওর মাথাতেও একই চিন্তা চলছে।

আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে ও বলল, "ওইখানে যাই, চল!"

অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়লাম, "এখান থেকে বেরিয়ে ঠিক কোন রাস্তায় যেতে হবে সেটা বুঝব কীভাবে? আমরা যে পথে এসেছি ওই পথে ফিরে গেলে ততক্ষণে ওরা পালিয়ে যেতে পারে।"

ঘরের একমাত্র দরজাটা দেখিয়ে কাল্লু বলল, "চল, আমরা এইখান দিয়া বাইর হই।"

হাত উপর করলাম। "এই রাস্তা কোথায় যায় কে জানে! পরে আবার হারিয়ে গেলে সমস্যা। তখন তাড়াতাড়ির জায়গাতে আরও দেরি হবে।"

ওর সাথে কথা বলতে বলতেই মনিটরে ফের তাকালাম, সেখানে ফিরোজ কিংবা জলিলকে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই তবে রাহাতকে অজ্ঞান অবস্থায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বেচারা! ওকে ওভাবে দেখে মায়া হলো।

আমাকে চুপচাপ দেখে কাল্লু তাড়া দিলো, "কি রে! কী করবি? একটা উপায় তো বাইর করতে হইবে নাকি?"

উপায় যে একটা বের করতে হবে সেটা আমিও জানি, কিন্তু কী সেটা? মোবাইলটা আবার বেজে উঠল, এবারে বিরক্ত হয়ে সুইচড অফ করে দিলাম। এই অসময়ে ফোন ধরার প্রয়োজন নেই। মাটির এত নিচে নেটওয়ার্ক কীভাবে পায় সেটাই আশ্চর্য!

কাল্লুর দিকে ফিরে বললাম, "দাঁড়া, আগে তো দরজাটা খুলে দেখি কী অবস্থা, তারপর ভাবা যাবে কী করা উচিৎ।"

কাল্লু সম্মত হলো, এগিয়ে দরজার হাতল ধরে মোচড় দিলো ও। দরজা খুলল না।

কাল্লু বিরক্ত হয়ে বলল, "আরি! কি সমস্যা! দরজা খুলে না ক্যান? হিরণ দ্যাখ তো।"

দেখে বুঝলাম, ওটা আসলে ডুয়াল লক, যার মানে বাইরে থেকে যদি চাবি

BanglaBook.org

দিয়ে লক করা হয় তাহলে ভেতর থেকেও চাবি দিয়ে খুলতে হবে এইরকম।

রিহ্যর চাবির গোছাটা বের করলাম। এর ভিতর থেকে অনেকগুলো চাবি আগেই ব্যবহার করেছি। যে বারোটা চাবি বাকি আছে সেগুলো একে একে দরজায় ভরে লকটা খোলার চেষ্টা করলাম। ঠিক নয় নম্বর চাবিটাতে গিয়ে কাজ হলো, হাঁপ ছাড়লাম। এই চাবিগুলো কাজ না করলে তালাটা খোলা কষ্টকর হতো। তালা খুলতে পারি ঠিকই, কিন্তু সব তালা তো আর সমান না, ঝামেলা থাকেই কিছু না কিছু। এক এক তালার এক এক ঝামেলা, সেটা সমাধান করে ফেলতে পারলেই তালা খুলে যায়, আর না পারলে বন্ধই থাকে।

দরজা খুলে বাইরে পা রেখেই খুশি হয়ে গেল কাল্লু। হাতের তালুতে আরেক হাত দিয়ে ঘুসি মেরে বলল, "আরে এইটা তো সেই রাস্তা যেইটা দিয়া পিছন থেইকা বাড়িতে ঢুকছিলাম।"

যাক তাও এতক্ষণে কোনও একটা ঘটনা তো আমাদের পক্ষে গেল। কাল্লু তাড়া দিলো, "চল, এক্ষুনি যাই, দেরি করা ঠিক হইবে না!"

"তুই যা, আমি এখানেই থাকব," বললাম ওকে।

চোখ কপালে তুলল ও, "ক্যান তুই এইখানে থাকবি ক্যান, থাইকা কী লাভ?"

"দুজন একসাথে গিয়ে যদি ধরা খাই তা হলে কি কাজের কিছু হবে?! তার উপরে ওদের সাথে পিস্তল আছে, আর আমাদের কাছে কিছুই নেই। তোর ওই খেলনা পিস্তল দেখিয়ে তেমন কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না। ফিরোজ খুব চালাক, ও ধরে ফেলতে পারে। তার থেকে তুই যা, ওদের শায়েস্তা করার হলে তুই একাই পারবি। আমি এমনিতেই মারামারি পারি না, আমার যাওয়া আর না যাওয়া সমান। তারচেয়ে এখান থেকেই নজর রাখব, তোকেও যদি আটকে ফেলে, ওরা চলে যাওয়ার পরে উদ্ধার করব।

"তুই যদি ওদের শায়েস্তা করতে পারিস, তবেই অভিযান সফল হবে," দৃঢ়ভাবে কাল্লুকে বললাম।

বাহবার সুর ফুটল ওর কণ্ঠে, "আরিব্বাস, তর মাথায় এত্ত বুদ্ধি আগে তো জানতাম না! এর পরে তো তরেও বস বইলা ডাকা লাগব!"

ছোট্ট করে ধমক দিলাম, "ফাজলামি বাদ দে, দ্রুত যা, পাখি উড়ে গেলে আর ধরা যাবে না। এটাই আমাদের শেষ সুযোগ। সাবধানে যাবি, বেশি বিপদ দেখলে সামনা সামনি ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনও দরকার নেই, ওরা চলে গেলে রাহাতকে উদ্ধার করবি, তারপরে সময় নিয়ে শুমেল আর বসকেও খুঁজে বের করা যাবে।"

কাল্লু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আচ্ছা। তুই এত টেনশন নিস না, আমি ওই দুইটারে টাইট দিতে একাই যথেষ্ট।"

অন্য কোনও দিন হলে এবং ফিরোজ আর জলিলের কাছে পিস্তল না থাকলে

BanglaBook.org

টেনশন নিতাম না। কিন্তু আজ কী ঘটবে সেটা আগেই ভেবে নেওয়া যাচ্ছে না। আজ কেবল শক্তিই না, তার সাথে বুদ্ধি আর ভাগ্যও কাল্লুকে কাজে লাগাতে হবে, নইলে বিপদ।

কাল্লু চলে যেতেই দরজা আটকে মনিটরের পর্দাতে চোখ রাখলাম। আলোকিত গ্যারাজে এখন সবগুলো গাড়িই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গাড়ি সর্বমোট চারটা, তার মধ্যে দুটো বড় আর দুটো ছোট। বড় দুটো গাড়ির একটা ম্যাকলারেন ব্রান্ডের আর একটা মার্সিডিজ। ছোট দুটোর একটা ফেরারি, অপরটা অ্যাস্টন মার্টিন। বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে সাধারণত এত দামি গাড়ি খুব একটা দেখা যায় না। প্রত্যেকটা গাড়ি রক্ষনাবেক্ষন করতে বিপুল পরিমান টাকা চাই। আমরা মুলত Ferreri গাড়িটাই হাতাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু যতগুলো ছবি পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছে, মার্সিডিজটা নিতে পারলে সবথেকে ভাল হবে।

চোখ ঘুরতে ঘুরতে ম্যাকলারেন গাড়িটার উপর এসে দৃষ্টি আটকে গেল। সেটার সামনের সিটে আবাছা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরাটা আরও একটু জুম করা গেলে ভালো হতো। আঙ্গেল এত দূরে সেট করা যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কেবলমাত্র গাড়িটা ছাড়া। এমনকী রাহাত যেখানে আছে সেখান থেকে ওকে রাহাত বলে চেনা সম্ভব না, আমি আগেই পুরো ঘটনাটা জানি বলে চিনতে পেরেছি।

কন্ট্রোল প্যানেল ঘেঁটে দেখার চেষ্টা করলাম, যদি জুম করার জন্য কোনও বোতাম সেখানে পাওয়া যায়। প্রতিটা ডিস্প্লে মনিটরের গায়ে নম্বর বসানো। কন্ট্রোল প্যানেলে গ্যারাজের মনিটরের গায়ে লেখা '৮' নম্বরটা খুঁজে চললাম। খুব বেশি খুঁজতে হল না, বামদিকের উপরের সারিতে বোতামটা পেয়ে গেলাম। ওখানে চাপতেই বোতামগুলোর থেকে কিছুটা দূরে একটা ছোট 'জয়স্টিক'-এরমধ্যে আলো জ্বলে উঠল। বুঝলাম এটা দিয়ে ক্যামেরার দিক ঠিক করা যাবে। সেটা ঘোরাতেই ক্যামেরাটাও ঘুরতে শুরু করল কিন্তু জুম তো করা যাচ্ছে না এখনও! রেগে গিয়ে জোরে সেটায় চাপ দিয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করতেই অন্য কোনও দিকে না ঘুরে জুম হওয়া শুরু করল। বুঝলাম, আলগাভাবে ঘোরালে ক্যামেরার দিক পরিবর্তন করা যায়, আর জোরে নিচের দিকে চেপে সামনে পেছনে নিলে জুম ইন-আউট হয়।

পুরো ব্যবস্থাটা বুঝে ফেলার পর কাজটা বেশ সহজই মনে হলো। অবলীলায় ক্যামেরা ঘুরিয়ে গাড়িটার উপর তাক করে ফুল জুম করলাম। এবারে সেখানে বসে থাকা মানুষটার চেহারা স্পষ্ট হলো। ওটা রিহা, এখনও মনে হয় ঘুমাচ্ছে। খুব শিথিল ভঙ্গিতে ওখানে বসে রয়েছে, শারীরিক গতিবিধি একদম অনুপস্থিত। রিহার গায়ে এখন সম্পূর্ণ কাপড় রয়েছে। কে পরিয়েছে? হবে হয়তো ফিরোজ কিংবা জলিল। খালি গায়ে তো আর ওকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না, তা হলে আবার রাস্তায় সমস্যা হবে। তাও ভাল ফিরোজ ওকে ফেলে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি।

BanglaBook.org

সম্ভবত জলিলও ফেলে যেতে চাইতো না। সুন্দরি হলে আসলেই অনেক সুবিধা দেখা যাচ্ছে!

ক্যামেরাটা গাড়ির সোজাসুজি লাগানো থাকায় কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল, পাশে লাগানো থাকলে জুম করে গাড়ির ভেতরটাও দেখা যেত। একপাশের স্লাইডিং দরজাটা খোলা, সেখান দিয়েই দেখা যেত। দুর্ভাগ্য, ক্যামেরা সে পাশে নেই।

কাল্লু ওখানে পৌছাতে আরও কতক্ষণ লাগবে জানি না। ফিরোজ আর জলিলকে এখনও দেখা যাচ্ছে না গ্যারাজের মধ্যে, সুতরাং কাল্লুর হাতে কিছুটা সময় আছে। অন্য মনিটরগুলোতে চোখ দিয়ে ফিরোজকে খোঁজার চেষ্টা করলাম।

অবশেষে ওর দেখা মিলল। ঘরের সদর দরজা ধরে বেরিয়ে এল দুজন, জলিল আর ফিরোজ। ধরা ধরি করে কাকে যেন সাথে করে নিয়ে আসছে। জুম করে আরও কাছে গেলাম। এবারে পরিষ্কার দেখা গেল, ওটা রঞ্জন। কিন্তু ওরা রঞ্জনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

ওরা রঞ্জনকে নিয়ে গ্যারাজের দরজা দিয়ে ঢুকল। সেখানে ওর শরীরটাকে এক কোনায় নিয়ে রাখল। দেখলাম ওখানে আগে থেকেই শুমেলকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কোনাটা গ্যারাজের একটু ভেতরের দিকে দেখে এতক্ষণ সেদিকে নজর যায়নি, এখন আবাছা দেখতে পাচ্ছি।

রঞ্জনকে রেখেই ওরা রাহাতের শরীরটা হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাকি দু'জনের কাছে। ওকেও সেখানে শুইয়ে দিলো। লক্ষ্য করলাম ফিরোজ আর জলিল নিজেদের মধ্যে কী সব কথা বলতে শুরু করেছে। এমন সময় কোথা থেকে যেন কাল্লু শূন্যে ভেসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের উপর।

অতর্কিত আক্রমনে ছিটকে গেল জলিল। ফিরোজও কেমন টালমাটাল হয়ে কিছুটা দূরে সরল। জলিল উঠে দাঁড়ানোর আগেই কাল্লু ওর তলপেটে লাথি মারল, যন্ত্রনায় কুঁকড়ে গেল ও। ওদিকে ফিরোজ সামলে নিয়েছে, সে পকেটে থেকে পিস্তল বের করার চেষ্টা চালাল। কাল্লু ওর হাতের উপর নিদারুণ দক্ষতার সাথে লাথি বসিয়ে সেটাকে প্রতিরোধ করল। ফিরোজ অপর হাত দিয়ে লাথি খাওয়া হাতটাকে চেপে ধরল। কাল্লু ওকে যেন সামলে নেবার সুযোগ দিতে চাইল না, এগিয়ে ফিরোজের থুঁতিতে ঘুসি ঝাড়ল। ঘুসি খেয়ে ফিরোজের ঘাড় ঘুরে গেল বেশ অনেকটা, ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে জলিল কিছুটা সামলে উঠেছে। সে কাল্লুর পা ধরে সজোরে টান দিলো, কাল্লুও মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। জলিল এই সুযোগে পকেট থেকে পিস্তল উদ্ধার করল। কিন্তু, সেটা তাক করার আগেই কাল্লু ডিগবাজি দিয়ে জলিলের একদম কাছে চলে গেল, তারপর পিস্তল ধরা হাতটা ধরে হ্যাচকা টান দিলো। এবারে জলিল সহজে পরাস্ত হল না, দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হলো।

BanglaBook.org

প্রায় মিনিট খানেক ধস্তাধস্তির পর কাল্লু জলিলকে প্রায় কাবু করে ফেলল। আর একটু হলেই পিস্তলটা নিয়ে নেবে এমন সময় ফিরোজ উঠে দাঁড়াল, লাথি মারল গিয়ে পিস্তলটার উপর। ওটা ছিটকে গ্যারাজের ভেতর দিকে চলে গেল।

পিস্তল হাত থেকে ছুটে যেতে দেখে কাল্লু প্রথমেই জলিলকে কাবু করতে চাইল। আধশোয়া অবস্থাতেই জলিলের চোখের উপর বেদম ঘুসি বসাল। জলিল চোখ চেপে ধরে যন্ত্রনায় ছটফটিয়ে উঠল।

অপর দিকে কাল্লুকে কাবু করতে ফিরোজ ওর পিঠে লাথি কষল; ও লাথি খেয়ে সটান হয়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে গেল। এই সুযোগে ফিরোজ পিস্তল বের করল। কাল্লু মনে হলো সেটা দেখতে পায়নি, ও ফিরোজের দিকে পেছন ফিরে ছিল। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল কাল্লু। জলিল সহজে উঠতে দিলো না, মরিয়া হয়ে কাল্লুর প্যান্ট ধরে টান মারল, কাল্লু ব্যালেন্স হারাল।

এই সুযোগে ফিরোজ খুব সাবধানে কাল্লুর ডান পায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে একটা গুলি করল।

গুলি খেয়ে কাল্লু গলা কাটা মুরগির মত ছটফটিয়ে উঠল। রাগে যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে ফিরোজের গলা টিপে ধরতে চাইল। কিন্তু ওর ক্ষিপ্রতা পায়ে গুলি খাওয়ায়, অনেকটাই কমে গেছে। ফিরোজকে ধরতে পারার আগেই সে অনায়াসে পাশ কাটিয়ে বাঁচল এবং নিখুঁতভাবে ওর পায়ের ক্ষততে আরেকটা গুলি করল।

এবারে কাল্লু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, যন্ত্রণায় শুয়ে পড়ল। পা চেপে ধরে ছটফট করতে থাকল। ওর যন্ত্রণা দেখে আমারও খুব খারাপ লাগল, এখন মনে হচ্ছে এক সাথে গেলেই হতো, তাহলে হয়তো দুজনে মিলে ঘটনাটা সামাল দিতে পারতাম।

ফিরোজের ঠোঁটের কোনায় শয়তানি হাসি দেখে মেজাজ আরও বিগড়ে গেল। কিন্তু, এখন আর ওখানে যাওয়ার সময় নেই, গিয়েও লাভ নেই!

জলিল উঠে দাঁড়াল। চোখ ডলল ডান হাতে, প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। চোখ ডলতে ডলতেই কাল্লুর তলপেটে কষে লাথি মারল, ওর পায়ের ক্ষতেও লাথি কষল দুই-তিন বার। কাল্লু ছটফট করতে করতে গড়িয়ে আরও কিছুটা দূরে সরে গেল। জলিল আরও কয়েকটা লাথি মারতে এগিয়ে যাচ্ছিল, ফিরোজ তাকে কাঁধে হাত দিয়ে থামাল। তারপর কী যেন বলল! বুঝতে পারলাম না। ক্যামেরা দিয়ে কেবল ছবি দেখা যায়, শব্দও শোনা গেলে ভাল হতো।

জলিল ফিরোজের সাথে কথা বলা শেষ হতেই কাল্লুর দিকে না এগিয়ে গেল ম্যাকলারেন গাড়িটার দিকে। ভেতর থেকে দড়ি নিয়ে এল, মাঝারি মোটা আকারের। দড়িটা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল কাল্লুকে। এরপর গায়ের ধুলো ঝেড়ে দুজন গিয়ে গাড়িতে উঠল।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

জলিল ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিল। এখনই ওরা পালিয়ে যাবে। তা হলে ছবিগুলো কি আগেই গাড়িতে ভরে ফেলেছে?! হবে হয়তো, রান্নাঘরে অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে।

এক দিক থেকে দেখতে গেলে মন্দের ভাল যে কাল্লুকে মেরে ফেলেনি। জলিলের হাতে বন্দুক থাকলে ঠিক মেরে ফেলত। ফিরোজ সচেতন, খুন না করে পার পাওয়া যাবে দেখে সে বোধহয় খুনটা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রিহা সামনের সিটে বসে হাই তুলল, এইমাত্র ওর ঘুম ভেঙেছে। অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কী হয়েছে যেন বুঝে উঠতে পারছে না! এরমধ্যে গাড়িটা চলমান হলো।

সহসাই গ্যারেজে ভূমিকম্প হলো। গাড়িটা সামনে যেতে গিয়ে তাল সামলাতে পারল না। রিহা গাড়ির মধ্যে ঝাঁকি খেয়ে জানালার সাথে আছড়ে পড়ল। ফিরোজ ভেতরে বসে ছিল, তাই ওকে দেখা গেল না। জলিল চেষ্টা করল গাড়িটা দ্রুত গ্যারাজের বাইরে নিয়ে যাবার, সফল হলো না।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে সম্পূর্ণ গ্যারেজটাই ক্রমশ মাটির নিচে নেমে যেতে শুরু করল।

১৪

সময়: রাত ১০:৫২

কী দেখছিলাম নিজের চোখকেই বিশ্বাস হলো না। ক্যামেরায় পরিষ্কার দেখা গেল গ্যারাজের সম্পূর্ণ মেঝেটা নিচের দিকে নেমে চলল, তারপর একটু একটু করে গায়েব হয়ে গেল আঁধারের বুকে। সেই সাথে গাড়ি, রিহা, জলিল, ফিরোজ, শুমেল, রঞ্জন, কাল্লু, রাহাত সবাই একত্রে ভূগর্ভে হারিয়ে গেল।

হাহাকার করে উঠলাম। এর থেকে তো ফিরোজরা পালিয়ে গেলেও ভাল হতো, তা হলে সঙ্গিদের উদ্ধার করে সেখান থেকে কোনওভাবে পালিয়ে যেতে পারতাম। এখন কী করবো? কীভাবে ওদের উদ্ধার করবো? দিশেহারা হয়ে সবগুলো মনিটরের পর্দায় চোখ রাখতে শুরু করলাম, কোথাও ওদের দেখা যায় কি না সেই আশায়। দুর্ভাগ্যবশত কোথাও ওদের দেখা গেল না। ক্যামেরাটা গ্যারাজের দেয়ালে খাঁজের মধ্যে লাগানো। জায়গাতেই রয়েছে ওটা। যদি কোনওভাবে মেঝের সাথে নিচে নেমে যেত তাহলে নিশ্চিত হওয়া যেত ওরা আদৌ বেঁচে আছে কি না!

অন্য পর্দাগুলো খোঁজা শেষ হতে আবার চোখ ফেরালাম গ্যারেজের ডিস্‌প্লেতে, যা দেখলাম তাতে চেয়ার থেকে পরে যাবার জোগাড় হলো। একি! গ্যারাজটা আবার ঠিক আগের মতো দেখাচ্ছে! এমন অবস্থা, যেন সেখানে কিছুই হয়নি! সেই আগের চারটা গাড়ি যার যার জায়গামতো দেখা গেল, অক্ষত অবস্থাতে। চেয়ারে বসেই ঘেমে নেয়ে উঠলাম, কী হচ্ছে এসব? এটুকু বোঝা যাচ্ছে যা হচ্ছে মোটেই ভাল হচ্ছে না। যুক্তির বাইরে কোনও কিছু হলে সেটা কখনও মঙ্গলের হয় না। এমনিতে ইন্দ্রজাল দেখতে আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু আজকের দিনটা ঠিক মজা করার মতো না। এখন গ্যারাজের সামনে এসে যদি বিখ্যাত জাদুকর 'ডেভিড কপারফিল্ড' বলেন, 'ম্যাজিক' তাহলে খুন করে ফেলব, নির্ঘাত।

এভাবেই দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে গিয়ে মিনিট কুড়ি পার হয়ে গেল। অস্থিরভাবে কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ঘুসি মেরে উঠে দাঁড়ালাম, এখানে বসে থাকলে চলবে না, গ্যারাজের ওখানে গিয়েই দেখতে হবে কী ঘটনা। দ্রুত দরজার কাছে গিয়ে হাতল ঘোরালাম, দরজা খুলল না, একি সর্বনাশ! পকেট থেকে চাবি নিয়ে লকে ঢুকিয়ে ঘোরালাম, কোনও ফল পেলাম না। মনে হচ্ছে আরও কিছু বাড়তি লক দরজায় অদ্ভুতভাবে জুড়ে বসেছে। তাই চাবি দিয়ে একটা লক খুলল, বাকিগুলো দরজাটাকে ধরে রাখছে শক্ত করে। সেসব লক খোলার জন্য কোনও চাবি ঢোকানোর জায়গাও নজরে এল না।

BanglaBook.org

মুক্তির আশায় ছুটে গেলাম বুক শেলফটার কাছে, যদি সেখান থেকে বের হবার কোনও উপায় পাওয়া যায়, চেষ্টা করে দেখতে। ধাক্কা দিয়ে প্রথমেই সেটা সরাতে চেষ্টা করলাম, কোনও ফল হলো না তাতে। আর হবেই বা কেন! ঢোকার সময়ও তো ধাক্কা দিয়ে ওটা খোলা যায়নি, তার জন্য অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়েছিল। এখনও কি তেমন কিছু করতে হবে সুড়ঙ্গ পথটা খোলার জন্য? কে জানে, তবে চেষ্টা তো করতেই হবে!

যারা যথেষ্ট পরিমানে রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের বই পড়ে থাকেন তারা জানেন, এরকম বুকশেলফের মধ্যে থেকে অনেক সময় কোনও নির্দিষ্ট বই টেনে সরিয়ে ফেলতে পারলে গুপ্ত দরজা খুলে ফেলা সম্ভব। সুতরাং, বই পড়া বিদ্যা কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম। একে একে সব বই টেনে বের করতে শুরু করলাম।

বইয়ের সংখ্যা যেন অসীম, কতক্ষণ ধরে টেনে বের করেছিলাম সঠিক বলতে পারব না, কিন্তু মেঝেতে ফেলা বইগুলো একটা ছোটখাটো স্তূপ তৈরি করে ফেলল।

একেবারে শেষ বইটা যখন মেঝেতে ফেললাম তখনও দেয়ালটা আগের মতো অনড় থেকে গেল।

নিদারুণ পরিশ্রমে শরীর থেকে টপ টপ করে ঘাম ঝরছে, ক্লান্ত হয়ে সোফায় বসে পড়লাম। এখন রঞ্জন, কাল্লু, শুমেল, রাহাতকে বাঁচানোর থেকে নিজে বাঁচার চিন্তাটা প্রাধান্য পাচ্ছে। হয়তো সেটাই স্বাভাবিক। এতক্ষণ পর্যন্ত যত যা-ই হোক, নিজের পালানোর রাস্তাটা বিশেষ কঠিন ছিল না, শুধু ধৈর্য ধরে ওদের চলে যাওয়া পর্যন্ত বসে থাকতে পারলেই হতো। তাই বাকিদের বাঁচানোর কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পেরেছি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, আমি নিজেই এখন বন্দি। নিজেকে বাঁচানোর থেকে বড় কর্তব্য পৃথিবীতে আর কিছুই হতে পারে না। পরে এখান থেকে বের হতে পারলে পুলিশকে ফোন দিয়ে জানিয়ে দিলেই হবে, ওরা এসে সবাইকে উদ্ধারের কোনও না কোনও ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলবে। তখন যদি ওরা জেলের ঘানি টানতে বাধ্য হয়, তবুও ভাল।

টানা পরিশ্রমের ফলে নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এসেছে, প্রচুর পিপাসাও লেগেছে। ফ্রিজ খুলে একটা ঠাণ্ডা পানির বোতল বের করে চুমুক লাগালাম। ফ্রিজের মধ্যে যেটুকু খাবার মজুদ দেখতে পেলাম তাতে হয়তো ছয় সাত দিন আরামে চলে যাবে। কিন্তু তারপর? ততদিনে বারেক কালিয়ান চলে আসবে। সে কি আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে?

মনে মনে নিজেকে ধমকালাম, এত দ্রুত ভেঙে পড়ার সময় এটা নয়। এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। বিপদ যখন রয়েছে তখন সেটা থেকে বাঁচার একটা

BanglaBook.org

উপায়ও নিশ্চয়ই আছে, এখন সেটাই খুঁজে বের করতে হবে। পানির বোতলটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে আবার তল্লাশি করে চালালাম, কোনও গোপন লুকিয়ে রাখা বোতাম অথবা পদ্ধতির জন্য যেটা ব্যবহার করে সুড়ঙ্গের মুখটা খুলে ফেলা যাবে। তাও ভাল, এই ঘরের মেঝেটা গ্যারাজের মতো নিচে নেমে যায়নি। সুড়ঙ্গের মুখটা কোনোভাবে খুলতে পারলে আমি আবার আগের রাস্তা ধরে দোতলায় যেতে পারব, সেখান থেকে বাইরে চলে যাব।

আবারও অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে। ফ্রিজ সরিয়ে, মাইক্রোওভেন সরিয়ে, সোফা উঠিয়ে, সবখানে খুঁজলাম; কিছুই পেলাম না। ব্যর্থ হয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। চোখ রাখলাম মনিটরে, যদি কিছু দেখা যায়। তেমন কিছুই দেখা গেল না। মরিয়া হয়ে আমি মোবাইলটা চালু করলাম। সেটা আরও বেশি হতাশ করলো, নেটওয়ার্ক শূন্য দেখাচ্ছে। দরকারের সময় কিছুই ঠিকভাবে কাজ করতে চায় না। মোবাইলটা ঠিক থাকলে হয়তো এখান থেকেই কাউকে ফোন করে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যেত। দুর্বলভাবে ওটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম।

কন্ট্রোল প্যানেলের ধার ঘেঁসে মেঝেতে হঠাৎ চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম, সেখানে কার্পেট মেঝে থেকে অনেকটা উঁচু হয়ে আছে। মনে করার চেষ্টা করলাম, যখন ঘরে এসেছিলাম তখনও এটা এ রকম ছিল কি না! তেমন কিছু মনে পড়ল না, জায়গাটা কিছুক্ষণ আগেও এতটা উঁচু ছিল না। কৌতূহলি হয়ে এগিয়ে গেলাম। টেনে কার্পেটটা সরানোর চেষ্টা করলাম। সহজে সরতে চাইল না। আরও জোর লাগাতে বাধ্য হলাম। একটু একটু করে কার্পেটটা সরে আসতেই সেটার নিচ থেকে একটা গোল ধাতব স্তম্ভ বেরিয়ে এল।

স্তম্ভটা দেখতে রুপালি রঙয়ের, গায়ের উপর কোনও খাঁজ নেই, একদম মসৃণ। শুধু উপরে একটা গোল সোনালী পাতের মতো বসানো, তার উপরে বিভিন্ন রকমের খাঁজ কাটা একটা ছিদ্র। স্তম্ভের নিচের অংশটাও খুঁটিয়ে দেখলাম, মনে হয় এটা সম্পূর্ণভাবেই কার্পেটের নিচে মাটিতে লুকানো ছিল, কোনও কারনে উপরে উঠে এসেছে। সেই কারনটা গ্যারাজের মেঝে নিচে নেমে যাবার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আপাতত শুধুই মনে হচ্ছে এই স্তম্ভ বেশ গুরুত্বপূর্ণ, এটার রহস্য ভেদ করা প্রয়োজন।

স্তম্ভের খাঁজগুলোর উপরে আঙুল রাখলাম, এগুলো খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু কেন?! কোথায় দেখেছি সেটাই এখন মনে করতে পারছি না। তবে দেখেছি নিশ্চয়ই, না হলে এত চেনা চেনা লাগতো না। গুনে দেখলাম, ঠিক পাঁচটা খাঁজ

BanglaBook.org

রয়েছে ওখানে, আর এক একটি খাঁজ বাকিগুলো থেকে ভিন্ন, কোনোটা তিন কোণা হলে অন্যটা চার কোণা, আবার কোনোটার মধ্যে চাইনিজ অক্ষরের মত করে কী সব আঁকা, কোনোটার মধ্যে শুধু ছোট ছোট কিছু বিন্দু। আমি খাঁজগুলো আঙুল দিয়ে চাপলাম, কোনও ফল হলো না। আঙুলও ঠিক মতো ভেতরে যাচ্ছিল না, কারণ খাঁজগুলো আঙুলের তুলনায় ছোট। নখ দিয়ে ভেতরের অংশটুকু স্পর্শ করার চেষ্টা করলাম বার বার। হতাশ হয়ে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দেব, এমন সময় একটা জিনিসের কথা মনে পড়ল। আশার আলো দেখতে পেলাম। হ্যা, ওটাই হতে পারে! আরও আগেই মনে আসা উচিৎ ছিল, ইশ চিরটাকাল বড্ড বোকাই থেকে গেলাম। রঞ্জন হলে আরও আগেই এটা আবিষ্কার করতে পারত।

কিছুক্ষণ আগেই সাথে করে আনা রঞ্জনের ব্যাগের ভেতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে জিনিসটার খোঁজ করলাম, পেয়েও গেলাম দ্রুত।

ব্যাগের মধ্যে থেকে জিনিসটা বের করেছি। আমার হাতে এখন সেই চাবিটা রয়েছে যেটা আমরা শিল্পীর সিন্দুকের গোপন কুঠুরি থেকে উদ্ধার করেছিলাম। এই চাবিটাতেও পাঁচটা খাঁজ কাটা রয়েছে, এটাই সেই জিনিস যা দিয়ে হয়তো এই স্তম্ভের ভেতর কোনও কারসাজি করা যাবে। সম্ভবত সেজন্যই এটাকে এত গোপনে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তবু আরও নিশ্চিত হতে স্তম্ভের মধ্যে থাকা খাঁজগুলোর সাথে চাবির পাঁচটা মাথার নকশা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। সবটাই মিলে যাচ্ছে, এখন আর কোনও সন্দেহ নেই এই চাবিটা এখানে ব্যবহারের জন্যই তৈরি করা হয়েছে।

তাৎক্ষণিক চাবিটাকে সেই স্তম্ভের সোনালী পাতের উপর বসিয়ে দিলাম। এরপর ওটা ঘোরাতে শুরু করলাম। প্রথম ডান দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করতে সেটা নড়ল না, আমি জোরে মোচড় দিলাম। চাবিটা মাঝখান থেকে কেমন নড়বড় করে উঠল, মনে হলো এক্ষুনি ভেঙে যাবে। অগত্যা, থেমে, বাম দিকে চাবি ঘোরালাম। এবার ঘুরতে শুরু করল ওটা।

সাথে সাথে ভূমিকম্প হলো। বুঝতে পারলাম, ঘরটা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক গাড়ির গ্যারাজ নিচে নামার মতো না, ওখানে কেবল মেঝেটা নিচে নেমেছিল, কিন্তু এখানে পুরো ঘরটাই নিচে নামছে। আমি চাবি ঘুরিয়ে চললাম, একটু একটু করে স্তম্ভটা মাটির নিচে বসে যেতে থাকল, সেই সাথে ঘরটাও নিচে নেমে চলল। এইভাবে প্রায় সতের বার ঘোরানোর পর স্তম্ভটা একদম মাটির নিচে ঢুকে গেল, সেই সাথে ঘরটা নিচে নামাও বন্ধ হলো। চেষ্টা করে দেখলাম, কিন্তু চাবি আর ঘুরল না, চাবিটা তুলে আগের জায়গাতে রেখে দিলাম।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

কতটা নিচে নেমেছি সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে ঘরটা নিচে নেমেছে মাত্র, সেটার অন্য কোনও পরিবর্তন হয়নি। বুকশেলফটা আবার সরানোর চেষ্টা করলাম, কোনও ফল হলো না। অবশেষে মরিয়া হয়ে দরজার হাতলে গিয়ে মোচড় দিতেই সেটা খুলে গেল। আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে হলো। এই ঘরে এতক্ষণ বন্দি থেকে এক রকম দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে নিশ্চয়ই কোনও সুড়ঙ্গ রয়েছে! সেখান দিয়ে অবশ্যই বাইরে বের হবার একটা উপায় পাওয়া যাবে।

রঞ্জনের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কপালে জমে থাকা ঘাম হাতের পেছন দিয়ে মুছলাম। মুক্তির সময় উপস্থিত, বিন্দুমাত্র দেরি না করে দরজার বাইরে পা রাখলাম।

১৫

সময়ঃ রাত ১২:৪৩

কন্ট্রোল রুমের বাইরে হতভম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। হতভম্ব হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ঘরের ভেতর দীর্ঘ সময় বন্দি থাকার পর সেখান থেকে বেরুতে পেরে অনেক খুশি ছিলাম। ভেবেছিলাম মুক্তির একটা পথ হয়তো দেখা যাচ্ছে। সমস্যাটা সেখানে হয়নি। সমস্যাটা হয়েছে অন্য জায়গাতে।

বাইরে বের হয়ে কন্ট্রোল রুমের দরজাটা বন্ধ করে দিতেই সেটা আপনা আপনি উপরে উঠে যেতে শুরু করেছে, এখনও সেটা উপরে উঠছে। অবশ্যই ঘরটাতে আবার ফিরে যেতে চাই না, কিন্তু ওটা নিঃসন্দেহে বের হবার একটা পথ ছিল। হয়তো তখন দিশেহারা ছিলাম দেখে বুকশেলফের পেছনের রাস্তাটা খুলতে পারিনি, মাথা ঠাণ্ডা করে আরও খুঁজলে পাওয়া যেত। তাছাড়া কার্পেটের নিচে তো আমি খুঁজেই দেখিনি! সেখান থেকেই তো নিচে নামার ব্যবস্থাটা পেলাম।

এখন আর সেসব ভেবে কোনও লাভ নেই। টের পেলাম ঘরটা উপরে ওঠা এইমাত্র বন্ধ হয়েছে। এখন দরজার জায়গাতে কেবলই একটা নিরেট দেয়াল দেখা যাচ্ছে।

যাক যা হবার হয়েছে, এখন সামনে এগুনো প্রয়োজন। ঘন অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরে সামনে এগুলাম। মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় কষ্ট করে এবড়ো থেবড়ো পথ চলতে হচ্ছিল। সুড়ঙ্গের দেয়াল থেকে মাটির ভেজা গন্ধ নাকে ভেসে এল, সেটা থেকেই বুঝলাম জায়গাটা মাটির নিচে। তবে ঠিক কতটা নিচে সেটা ধারণা করা যাচ্ছে না আপাতত। সুড়ঙ্গটা সোজা এগিয়ে চলল, তারপরে প্রায় বেশ কতক্ষণ হেঁটে যাবার পর ডানে ঘুরল। এরপর আবার ডানে ঘুরল; কিছুটা সোজা গিয়ে বামে ঘুরল; আবার কিছুটা গিয়ে ফের বামে ঘুরল।

এভাবেই একদম শেষ মাথাতে এসে পৌঁছলাম, এক মুখি সুড়ঙ্গ হওয়াতে পথ হারানোর অসুবিধা নেই। শেষ মাথায় এসে একটা দরজা আবিষ্কার করলাম। এমনই কিছু একটা আশা করছিলাম। সকাল থেকে একের পরে এক দরজা খুলতে খুলতে আমার দরজা সম্পর্কিত ইনটুইশন বর্তমানে অনেক শক্তিশালি হয়ে উঠেছে। এই দরজাটা খুলতে তেমন বেগ পেতে হলো না। সামনে দাঁড়াতেই দরজা আপনা-আপনি খুলে গেল। ভেতরে যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত চলেই গেলাম।

দরজাটা আমার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাশ দিয়ে কে যেন ছুটে গিয়ে দুম করে দরজার উপর আছড়ে পড়ল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে জলিলকে দেখতে পেলাম।

BanglaBook.org

দরজার উপর ক্রমাগত বাড়ি মারতে মারতে জলিল কেঁদে ফেলল। "খোলো, দরজা খোলো, ছেড়ে দাও আমাকে, যেতে দাও, বাঁচাও।"

জলিলের থেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ফিরোজ আমার দিকে তির্যকভাবে তাকিয়ে আছে, তার হাতে উদ্ধত পিস্তল। দু-হাত উপরে তুললাম 'হ্যান্ডস আপ' বলার আগেই। ফিরোজ আমাকে অবাক করে বন্দুকটা নামিয়ে পকেটে ভরল। তারপর বিষণ্ন মুখে একটা চেয়ারের উপর গিয়ে বসল।

ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে বাকিদের দিকে চোখ রাখলাম।

ঘরের মাঝখানে পাতা একটা টেবিল, টেবিলের উপর দিকটা গোল আর নিচের দিকটা একটা চোঙ্গের মত সরু হতে হতে একদম মেঝেতে গিয়ে মিশেছে। পুরো টেবিলটাই যেন নিরেট স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি। টেবিলের উপরে ধার ঘেসে দুটো প্লাস্টিকের জগ আর কিছু কাঁচের গ্লাসও নজরে পড়ল। টেবিলটা ঘিরে মোটামুটিভাবে বারোটা কাঠের চেয়ার পাতা, তাদের কোনোটার হাতল আছে আবার কোনোটার নেই। তারই একটা চেয়ারে এখন ফিরোজ বসে রয়েছে।

ফিরোজের পেছনের চেয়ারে বসেছে রিহা, এখন টেবিলের উপর হাত রেখে ঝিমাচ্ছে। মনে হয় ঘুম এখনও ঠিক মতো ভাঙেনি। আমার চোখে চোখ পড়তেই ওর চোখ দুটো বারুদের মতো জ্বলে উঠল। সেখানে এমন তেজ ঠিকরে বেরুচ্ছিল যে ক্ষমতা থাকলে আমাকে ভস্ম করে দিত। ওর এত রাগের কোনও যুক্তি খুঁজে পেলাম না, আমিও তো ঠিক একইভাবে রাগ করতে পারি! সুন্দরি বলে সব করার লাইসেন্স আছে নাকি ওর? সেটা ভেবে থাকলে ভুল ভাবছে।

কড়া চোখে ওর দিকে তাকালাম। ও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল আমার চোখ গরম করা দেখে, দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিল।

রিহার সরিয়ে নেওয়া চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করতে গিয়ে ঘরের একপাশের দেয়ালের উপর চোখ পড়ল। সেখানে একটা সুদৃশ্য বিশালকার শো-কেস শোভা পাচ্ছে। শো-কেসের ভেতরটা অসংখ্য দামি দামি শো-পিস দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো। এই পাতালঘরে এত সাজসজ্জা বড্ড বেমানান লাগল। কিন্তু জিনিসটা থেকে আসলেই চোখ ফেরানো মুশকিল। শো-কেস থেকে কিছুটা উপরে একটা অ্যান্টিক ঘড়ি টিক টিক করে সময় জানান দিচ্ছে। অ্যান্টিক হলেও একদম ঠিক ঠাক কাজ করছে সেটা। রিহার দৃষ্টি এসবের কোনোটার দিকেই ছিল না, তার চোখ ছিল শো-কেসের পাশে মেঝেতে বসে থাকা মানুষগুলোর উপর।

মেঝেতে পাশাপাশি বসে ছিল রঞ্জন আর শুমেল। ওদের হাত-পা বাঁধা, আমাকে দেখে শুমেল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এমন করুন অবস্থায় জীবনে আগে কখনও ওকে পড়তে হয়নি। সারা জীবন আরাম আয়েশের মধ্যে থেকেছে। ইতিপূর্বে একটা কাজেও আমাদের এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। সম্ভবত আমাদের সাথে

BanglaBook.org

কখনও কাজ করতে রাজি হবার সিদ্ধান্তটাকেই ও এখন মনে মনে দোষারোপ করছে।

অপর দিকে রঞ্জনের চোখে হতাশার ভাবটা তেমন নেই, কিছুটা ক্রোধ সেখানে বাসা বেঁধেছে। হয়তো সেটা আমার উপরেই! ওকে কেন আমি উদ্ধারের চেষ্টা করিনি আগে-ভাগে, সেটাই ভাবছে বসে। কিন্তু ঘটনাটা ও যেভাবেই দেখুক, উপায় থাকলে যে ওকে উদ্ধার করতাম সেটা ও ভাল করেই জানে।

ঘরের একপাশে মেঝেতে শুয়ে কালু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে গুলিতে ওর বাম উরুতে এখন বিশাল এক গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত ফিরোজ কাছাকাছি জায়গাতে একাধিক গুলি না করলে এটা এত বড় হতো না। কালু করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখ বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে মেঝেতে, এর আগে ওকে কখনও এতটা অসহায় দেখিনি। ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছে যেতেই আরও সামনে থেকে ক্ষতটায় নরজ দিতে পারলাম। দূরে থেকে সেটা যতটা না বাজে লাগছিল কাছে থেকে তার চাইতে অনেক বেশি ভয়ংকর মনে হলো। ক্ষত থেকে রক্ত তখনও চুইঁয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে বেচারা বেশিক্ষণ চেতনা ধরে রাখতে পারবে না। তবে ক্ষতটা একমুখি নয়, পায়ের অপর পাশেও ফুটো হয়েছে। তার মানে গুলি ভেতরে আটকে নেই। সুতরাং, ইনফেকশন হবার সম্ভাবনা কম। অবশ্য দ্রুত চিকিৎসা না করা গেলে কী হয় কিছুই বলা যাচ্ছে না।

কালুর ঘামে জবজবে গেঞ্জিটা ওর শরীর থেকে খুলে পায়ের ক্ষততে বেঁধে দিলাম। কোনও বাঁধা দিলো না ও, বাঁধা দেওয়ার শক্তিটুকুও খুইয়েছে। বেঁধে দেয়া গেঞ্জিটার উপর দিয়ে রক্তের ছাপ ক্রমশ স্পষ্ট হলো।

জলিল ব্যকুল হয়ে দরজায় আঘাত করে যাচ্ছে অনবরত, হয়তো ভাবছে বেশ কিছুক্ষণ মারামারি করলে ওই দরজা তার কাছে হার মেনে খুলে যাবে। অথবা, জানে যে খুলবে না, কিন্তু কী করবে বুঝতে না পেরে শেষ একটা চেষ্টা চালাচ্ছে। মানুষ উদ্ধারের কোনও উপায় না পেলে অনেক বেশি দিশেহারা হয়ে যায়। কিন্তু, ফিরোজকে একটু ব্যতিক্রম মনে হলো, সে তুলনামূলকভাবে শান্ত, আর চুপচাপ; সম্ভবত পুরো ব্যাপারটা থেকে উদ্ধারের উপায় ভেবে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বুদ্ধিমান মানুষদের এই বিষয়টা আমাকে খুব অবাক করে, তারা খুব চাপের মধ্যেও ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে পারে। কীভাবে পারে কে জানে। তবে সবথেকে কম চাপের মধ্যে আছে রাহাত। সে এখনও দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে! শালাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দুই তিনটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে। ওর জন্যই আমাদের এই অবস্থা, ও একটু সতর্ক হলে এখানে থাকতে হতো না। জলিল ওকে কাবু করে ফেলাতেই যত গণ্ডগোল হয়ে গেল। না হলে ফিরোজকে শায়েস্তা করা কালুর জন্য এমন কোনও ঘটনাই ছিল না।

BanglaBook.org

ঘরের মানুষগুলোর মধ্যে কিছু একটা অসামঞ্জস্যতা রয়েছে, কিন্তু সেটা ঠিক কী আপাতত ধরতে পারছিনা। আমি আবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাইকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। যে যার জায়গাতেই রয়েছে, সহসাই ফিরোজের মুখোমুখি টেবিলের ঠিক অপর প্রান্তের চেয়ারটার উপর চোখ পড়তেই থমকে গেলাম।

চমকে উঠলাম, "একি! আপনি?"

চেয়ারের বসে বারেক কালিয়ানের মা আমার দিকে তির্যক দৃষ্টিপাত করলেন। "হ্যা আমি," সীমিত কথায় জবাব দিলেন তিনি।

"কি...কিন্তু", ভাষা হারিয়ে ফেললাম।

উত্তরে তিনি কিছু না বলে হাসলেন। উত্তর না পেয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, "আপনাকে ধরে আনলো কেন?"

ভদ্রমহিলা কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে ফিরোজ মুখ ঝামটা দিলো, "খবরদার আজে বাজে কথা বলবে না। ওনাকে কেউ ধরে আনেনি।"

"ধরে না আনলে কি উনি নিজে থেকে চোরের সাথে এখানে ঘুরতে এসেছেন?" পাল্টা জবাব দিলাম, ঝাঁজের সাথে।

ফিরোজ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল হাতে পিস্তল উঁচিয়ে, ভদ্রমহিলা বাঁধা দিলেন, "আহ! এত গণ্ডগোল করে কী লাভ? আমাকে কেউ ধরে আনেনি, আমি নিজেই এসেছি।"

আকাশ থেকে পড়লাম। বলে কী মহিলা! চোরের সাথে কেউ কোনোদিন স্বেচ্ছায় যায়?

তৎক্ষণাৎ বললাম, "কেন? ফিরোজ তো একটা চোর, আর রিহা আপনাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বেঁধে রেখেছিল, তবুও কেন আপনি এরকম দুটো বদমাশের সাথে বাড়ি থেকে স্বেচ্ছায় চলে আসবেন? আপনি মিথ্যা বলছেন।"

মহিলা ফিক করে হেসে ফেললেন। "বোকা কোথাকার! চোর হলেই কি, ছেলের সাথে মা আসবে না? এটা কেমন কথা?"

"মা! কার মা? কে মা?" আতংকের সাথে বললাম।

"কেন? আমি। ফিরোজের মা," বললেন তিনি।

ভুরু তুললাম, "কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন আপনি বারেক কালিয়ানের মা।"

"ওটা মিথ্যা," শান্ত গলায় জবাব দিলেন তিনি।

"তা...তা হলে আপনাকে আটকে রেখেছিল কেন ওরা? আর রিহাই বা আপনাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াবে কোন দুঃখে?" মহিলার কথায় যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করলাম।

BanglaBook.org

এবারে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন তিনি, রিহাও আমার মতই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ফিরোজের চোখে একরকম বিরক্তি দেখতে পেলাম, যেন বিপদের মধ্যে এসব অবান্তর কথা বলে শুধু শুধুই সময় নষ্ট হচ্ছে।

হাসি থামতেই উনি বললেন, "পুরোটাই নাটক, তোমাকে ধরার জন্য। আমারই বুদ্ধি, যখন রিহা দ্রুত কাজ সেরে ফিরে এল না, বুঝতে পেরেছিলাম কোনও একটা সমস্যা হয়েছে। এও বুঝেছিলাম যে তুমি অন্য ঘরগুলো ঘুরে দেখবে সুযোগ পেলে। তাই ফিরোজের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিই কাজটা করার। রিহা অবশ্য এসবের কিছুই জানে না, ওকে তো অজ্ঞান করে ফেলেছিলে।

"তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সাথে সাথেই আমি মোবাইলে ফিরোজকে খবর দিই, কিন্তু ও এসে দেখে চালাকি করে আমাকে ঘরে আটকে রেখেছ। তাই ঘরের ভেতর থেকে ওর সাথে কথা বলে পুরো ব্যাপারটা বোঝানোর আগেই পালিয়ে যেতে পেরেছিলে।"

হতবাক হয়ে মহিলার কথা শুনে চললাম, বিরাট বোকা বানিয়েছে। কিন্তু ফিরোজরা তাকে বের করলো কীভাবে? নিশ্চয়ই দরজা ভেঙেই বের করেছে। নিজের মা যখন তখন তো ফিরোজ তাকে ফেলে যেতে পারে না! রঞ্জন আর শুমেল কে বাইরে নিয়ে আসতে এতটা সময় কেন লেগেছিল সেটাও এবার বোঝা গেল।

মহিলা আমার মনে চলতে থাকা ভাবনাটা ধরতে পেরে বললেন, "অনেক কষ্ট করে দরজা ভেঙে আমাকে বের করেছে ওরা। না হলে এতক্ষণে আমরা এই শহর থেকে অনেকটা দূরে থাকতাম।"

ফিরোজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আসলে পিস্তলটা তোমাকে দিয়ে দিলেই ভালো হতো, তুমিই ওকে আটকে ফেলতে পারতে। ওই ষণ্ডাগণ্ডাটার কথা ভেবে দিইনি। নাহ! বড় ভুল হয়েছে তোমার কথা না শুনে।"

ফিরোজের মা সম্মতিতে মাথা নাড়লেন। "যেটা হয়ে গেছে, সেটা হয়ে গেছে; এ নিয়ে ভেবে কাজ নেই। এখন কী করা যায় সেটাই সবাই মিলে ভাবতে হবে। এখানে আটকে থাকলে কাজের কাজ কিছুই হবে না।"

হুম, তার মানে ওরা এখান থেকে বের হবার ভালই চেষ্টা করেছে এতক্ষণ। কিন্তু প্রশ্ন তারপরও একটা থেকেই যাচ্ছে ওরা এই ঘরের মধ্যে এল কী করে? আর যদি আসেই, তা হলে রঞ্জনদের কষ্ট করে টেনে আনল কেন?

রঞ্জনের কথা মনে হতেই নড়েচড়ে উঠলাম, ও অনেকক্ষণ ধরেই ভাবছে মুক্তির উপায়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই কোনও আইডিয়া ভেবে ফেলেছে; সবসময় সেটাই হয়, যা পরিকল্পনা সেটা ওর মাথাতেই ভাল আসে। সুতরাং, ওর মতো একজন প্রতিভাবান চিন্তাবিদকে আটকে রেখে লাভের লাভ কিছুই হবে না। আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

রঞ্জনের বাঁধন খোলার চেষ্টা করতেই ফিরোজ পিস্তল উঁচিয়ে বাঁধা দিলো। "এই! এই! কী করছ? বাঁধন খুলছ কেন?"

আমি ঠাণ্ডা মাথায় বললাম, "বেঁধে রেখে কোনও লাভ হচ্ছে কি? তার থেকে সবাই মিলে একসাথে ভাবলে ভাল না? বস বুদ্ধিমান লোক, হাত পা খোলা থাকলে সে নিশ্চয়ই কোনও ভালো উপায় বের করতে পারবে।"

আমার কথা শুনে ফিরোজ মিটি মিটি হাসল, "ও এই তাহলে তোমাদের বস! কত বুদ্ধিমান সেটা তো দেখাই যাচ্ছে, শিঙ্গারা খেয়ে কুপোকাত!"

ফিরোজের খোঁচায় রঞ্জন যে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সেটা বোঝাই গেল, কিন্তু একজন বুদ্ধিমান মানুষের যেটা করার কথা ও সেটাই করলো, চুপ চাপ মাথা নিচু করে বসে থাকল।

আমি অনুমতি প্রার্থনা করলাম, "খুলব?"

ফিরোজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "খোল!"

প্রথমে রঞ্জন আর তারপরে শুমেলের বাঁধন খুলে দিলাম। এগিয়ে গিয়ে কাল্লু আর রাহাতের বাঁধনও খুলে দিলাম। রাহাত এখনও ঘুমাচ্ছে, হতভাগাটা আরও কতক্ষণ ঘুমাবে কে জানে! আমি ওকে টেনে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে শুইয়ে দিলাম। ঘুমিয়ে পড়লে মানুষের শরীরের ওজন অনেকগুন বেড়ে যায়। রাহাতকে টেনে দেয়াল পর্যন্ত আনতে ঘাম ছুটে গেল।

জলিল এতক্ষণে দরজা খোলার হাল ছেড়ে দিয়েছে। একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে হাহাকার করছে। থেকে থেকেই তার বউয়ের কাছে ফিরে যাবার জন্য বিলাপ করছে। ফিরোজ ধমক দিতেই বিলাপটা একটু কমল কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ হলো না।

রঞ্জন দাঁড়িয়ে প্রথমেই জামা প্যান্ট থেকে ধুলো ঝাড়ল, তারপর কাল্লুর কাছে গিয়ে ওর অবস্থা পরীক্ষা করে দেখল। গালে হাত দিয়ে গম্ভির ভঙ্গিতে আমি যে দরজাটা দিয়ে ঢুকেছি সেটার দিকে এগিয়ে গেল এরপর। দরজাটা পরীক্ষা করা শেষ হতেই ও আমার দিকে ফিরল, "তুই এখান দিয়ে ঢুকলি কীভাবে?"

উত্তরে ওকে সব ঘটনা খুলে বললাম। আমার কথা শেষ হতেই ফিরোজ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো! অবাক হয়ে বলল, "কি! তুমি কন্ট্রোল রুমের ভেতর থেকে গোপন রাস্তা ধরে এখানে এসেছ?"

মাথা নেড়ে বললাম, "হুম!"

"তা হলে তো আমরা আবার ওই পথেই ফিরে যেতে পারি, তোমার কাছে তো চাবি আছেই!" উত্তেজিতভাবে বলল ফিরোজ, এই প্রথম ওকে এত উত্তেজিত হতে দেখলাম।

"নাহ, সেটা করা বোধহয় সম্ভব না," নিরাশ করলাম ওকে।

BanglaBook.org

"কেন?" সাথে সাথেই জানতে চাইল ফিরোজ।

এই প্রশ্নের উত্তরে পুরো ঘরটা উপরে উঠে যাওয়া থেকে শুরু করে এখানে আসার পরে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবকিছুর নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে দিলাম। সব শুনে, ফিরোজ আবার হতাশ হয়ে আগের চেয়ারটাতে বসে পড়ল।

দেখলাম রঞ্জন তখনও ভাবছে, কী এত ভাবেছে কে জানে। শুমেলও এতক্ষণে উঠে বসেছে, এখন আনমনে ঘাড় ডলছে। সম্ভবত ওকে এখানে নিয়ে আসার সময় ঘাড়টা বেকায়দায় পড়েছিল, তাই এখন ব্যথা করছে।

রঞ্জন ভাবনা শেষ করে ফিরোজের কাছে গেল। তাকে সহজভাবে প্রশ্ন করলো, "তোমরা আমাদের এই ঘরে কোথা থেকে নিয়ে এসেছ?"

ফিরোজ চোখ ছোট করে রইল কিছুক্ষণ। রঞ্জন ওর সাথে এমন সহজভাবে কথা বলবে বুঝতে পারেনি। কিন্তু ও বুদ্ধিমান, দ্রুত সামলে নিয়ে ঘরের একদম কোনায় আঙুল তুলে একটা খোলা দরজা দেখিয়ে দিলো।

এতক্ষণ দরজাটা চোখে পড়েনি, ফিরোজ দেখিয়ে দিতেই অবাক হলাম। রঞ্জন সেদিকে অগ্রসর হতেই ফিরোজ বলল, "লাভ নেই! ওখানে কোনও দরজা কিংবা বোতাম নেই, খুঁজে দেখা হয়েছে।"

রঞ্জন ঠাণ্ডা মাথায় বলল, "সমস্যা নেই, আবার খুঁজব।" তারপর চলল খোলা দরজার দিকে।

মনে একটা খটকা ছিল, রঞ্জনকে হাত ধরে থামিয়ে দিয়ে ফিরোজকে প্রশ্ন করলাম, "ওখানে পালানোর যখন কোনও রাস্তাই নেই তাহলে ওদেরকে কষ্ট করে আবার এখানে টেনে আনার কী দরকার ছিল?"

তাচ্ছিল্যের হাসির সাথে ফিরোজ উত্তর দিলো, "সতর্কতা। শত্রুকে চোখের সামনে রাখতে পারলেই বেশি ভাল, চোখের আড়াল করে লাভ নেই।"

দ্বিমত হতে পারলাম না, আসলেই ঠিক, সুযোগ থাকলে আমিও এই কাজটাই করতাম।

মনে আরও একটা খটকা ছিল, অগত্যা পরের প্রশ্নটা করলাম, "তা হলে গাড়ি আর ছবিগুলো কি সব এখনও ওখানেই আছে?"

"হুম। আছে," ছোট্ট করে জবাব দিলো ফিরোজ।

"কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? আমি তো কিছুক্ষণ আগেই মনিটরে দেখে এলাম যে গাড়িগুলোসহ গ্যারাজটা ঠিক আগের মতই আছে!"

শুনে ফিরোজও অবাক হল, কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, "গাড়ি আগের জায়গাতে আছে? গ্যারাজও আগের মতো আছে? অসম্ভব!"

শুমেল রিহার পাশের চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে বলল, "সম্ভবত বাইরে কোথাও থেকে ফলস ভিডিও ফিড দিয়ে আসলটাকে পাল্টে দেওয়া হয়েছে।"

BanglaBook.org

কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে কি না সেটা ভাবাবার বিষয়, তবে এর বাইরে অন্য কোনও ব্যাখ্যাও আপাতত মাথাতে আসছে না। অন্য সবাইকে চুপ থাকতে দেখে রঞ্জনকে বললাম, "তা হলে দেখেই আসি ঘুরে।"

রিহা আবার হাই তুলল, যেন ওর কোনও পরোয়া নেই আমরা কী করলাম তাতে। কাল্লু করুণভাবে কাতরাচ্ছে। হয়তো শুয়ে আছে দেখে রক্তক্ষরণ বেশি হচ্ছে। আমি দরজার সামনে পা বাড়ানোর আগে শুমেলকে ডেকে কাল্লুকে ধরাধরি করে ফিরোজের মায়ের কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। কাল্লু আধবোজা চোখে প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে ফিরোজের দিকে তাকিয়ে রইল। শরীরে শক্তি থাকলে এতক্ষণে ওর টুটি ছিঁড়ে ফেলত।

বেকার দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হচ্ছিল রঞ্জন, কিন্তু একা যাওয়ার সাহসও সঞ্চয় করতে পারছিল না। আমাকে তাড়া দিলো ও, "কি-রে তোর হলো?"

কাল্লুর ঘাড়ে হালকা চাপ দিয়ে ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম, তারপর ওকে ওই অবস্থাতে রেখেই হেঁটে রঞ্জনের কাছে পৌঁছলাম। আমরা দুজনে দরজার দিকে গেলাম।

রঞ্জন ঘরের বাইরে ডান পা রাখার চেষ্টা করতেই প্রকাণ্ড শব্দে একটা লোহার পুরু পাত দরজার উপরের ফ্রেম ভেদ করে দ্রুত নিচের দিকে নেমে এল!

BanglaBook.org

১৬

সময়: রাত ০১ : ৫৩

রঞ্জনের বামহাতটা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ওকে দ্রুত দরজার নিচ থেকে সরালাম। ধাক্কা সামলাতে না পেরে রঞ্জন আছড়ে পড়ল মেঝেতে। উপরের দাঁতে ঘসা লেগে ওর নিচের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল টপ টপ করে। তাড়াতাড়ি ওকে গিয়ে ধরার চেষ্টা করলাম, ও একটা হাত উঠিয়ে আমাকে থামতে বলল। থেমে গেলাম। ও বুঝতে পারছে কাজটা আমি ওকে বাঁচানোর জন্যই করেছি, তবুও সাময়িক রাগ তো থেকেই যায়, সম্ভবত সেটাই সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় শুমেল, ফিরোজ, জলিল, রিহা, ফিরোজের-মা, সবাই নিজের নিজের চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেছে। উঠতে পারেনি শুধু কাল্লু, হয়তো ভাল করে দেখারই সুযোগ পায়নি কী ঘটেছিল। নিজের যন্ত্রণা নিয়েই সে বেশি চিন্তিত এখন।

মোটামুটি সামলে উঠতেই সবাই আবার নিজের নিজের চেয়ারে বসে পড়ল। রঞ্জনও নিজে থেকে উঠে ফিরোজের পাশের চেয়ারটাতে বসল। আমি কাল্লুর পাশে গিয়ে বসলাম। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি অবশিষ্ট নেই।

চেয়ারের হাতলে হেলান দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এক দিকের হাতল নেই, তাই বাধ্য হয়ে বামদিকের হাতলেই হেলান দিতে হলো। চেয়ারটা যদিও মজবুত, একটা হাতল কেন নেই কে জানে! এসব নিয়ে ভাবতেও ক্লান্ত লাগছে, ভাবার মতো আরও জিনিস আছে। প্রথমেই ভাবা দরকার কীভাবে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর কেনই বা এভাবে একের পর এক দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? কেউ এসব নিয়ন্ত্রন করছে। কিন্তু কেন? কীভাবে সেটা বন্ধের ব্যবস্থা করা যায় তাও ভাবা দরকার।

নিস্তব্ধটা ভাঙল শুমেল, "এটা কী হলো?"

রঞ্জন গম্ভিরভাবে বলল, "কী হলো সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে কীভাবে হলো।"

ওর ঠোঁট থেকে এখনও রক্ত চুইয়ে পড়ছে। ঠোঁটের কাঁটা খুব খারাপ হয়, সহজে রক্ত থামতে চায় না। লাল টকটকে হয়ে আছে রঞ্জনের দাঁতগুলো।

এতক্ষণে রিহা কথা বলল, "মনে হচ্ছে এর পেছনে কারও হাত আছে!"

একেই বলে গবেট মার্কা বুদ্ধি, এর পেছনে যে কারও হাত আছে এটা তো একটা ছয় বছরের বাচ্চাও চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবে। ওর এই কথা শুনে আমি ফিক করে হেসে ফেললাম।

ক্ষেপে গেল রিহা, "এতে হাসির কী আছে?"

BanglaBook.org

"সবাই বুঝতে পারছে কারও হাত আছে, ওই যে ঘুমাচ্ছে রাহাত, সেও সেটা স্বপ্নে বুঝতে পারছে। বাড়িতে বসে জলিল সাহেবের বউও বুঝতে পারছেন যে তার স্বামীকে কেউ বাড়িতে ফিরতে বাঁধা দিচ্ছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কে সে?"

"আমিই সে!!!" সহসা বাতাস চিরে শীতল কণ্ঠের অশরীরি আওয়াজ ভেসে এল। সবাই এদিক ওদিক তাকালাম, আশেপাশে কাউকেই দেখা গেল না।

শুমেল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কে...কে ওখানে?"

কণ্ঠটা হিমশীতল দৃঢ়তায় বলল, "আমি।"

এবারে সাহস করে বললাম, "ক্ষমতা থাকে তো সামনে এস, সামনে এস বলছি!"

"ক্ষমতা আমার যথেষ্টই আছে, হিরণ সাহেব, না হলে আপনাদের সবাইকে এক খাঁচায় কীভাবে বন্ধ করলাম, বলুন?" তাচ্ছিল্য করল কণ্ঠস্বরটি।

আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম রিহা, ফিরোজ, ফিরোজের মা কিংবা জলিল কেউ কোনও কথা বলছে না, ওরা হা করে শুধু শুনে যাচ্ছে।

বিভ্রান্ত হয়ে রিহাকে ধমক দিলাম, "কি ব্যাপার তোমরা কিছু বলছ না যে? বন্দি কি শুধু আমরা একাই নাকি?"

রিহা ভেঙে পড়ল। "কী বলবো? আমরা জানি এটা কে।"

"কে?" রিহার কথা শুনে সাথে সাথে প্রশ্নটা ছুঁড়লাম। ও জবাব দেবার আগেই উত্তরটা পেয়ে গেলাম। আমরা যে দরজাটা দিয়ে একটু আগে অন্য ঘরে যাবার চেষ্টা করছিলাম, সেই দরজাটার পাশ ঘেঁসে বিশাল দেয়াল জুড়ে একটা প্রজেক্টেড ছবি স্পষ্ট হলো।

ছবিটা দেখে শুমেলের মুখ থেকে অস্ফুট বেরিয়ে এল, "'বারেক কালিয়ান' আপনি!"

শিল্পী অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন, "হ্যা আমি! তোমরা কী ভেবেছিলে? আমার বাড়িতে এসে চুরি করে যাবে, আর আমি কিছুই বুঝতে পারব না? ভুল.. ভুল, তোমরা ভুল ভেবেছিলে।"

রঞ্জনও নিজের গাম্ভীর্য কিছুটা পেছনে রেখে বলল, "কিন্তু আপনি তো, প্রদর্শনিতে গিয়েছেন, তিন দিনের জন্য!"

"ওটা সাজানো, সবাইকে ধরার জন্য সাজানো," মুখের হাসিটা ধরে রেখেই বললেন শিল্পী।

ফিরোজ কিছুটা ভেঙে পড়ল। "সবটাই সাজানো?" মুখটা পাংশু করে বলল ও।

"হ্যা, সবটাই সাজানো," কাটাকাটাভাবে জবাব দিলেন শিল্পী।

জলিল বিকারগ্রস্থের মতো হয়ে গেল। "স্যার, আমারে মাফ করেন, বউ বাচ্চা আছে...স্যার...ছেড়ে দেন...স্যার..."

BanglaBook.org

বারেক কালিয়ান ধমক দিলো, "চুপ, একদম প্যান প্যান করবে না! চুরি করতে রাজি হবার সময় মনে ছিল না? এত যত্নে রাখি, সুবিধা দেই, তাও যেই থালাতে খাও সেটাতেই ফুটো করতে চাও! কোনও ক্ষমা তুমি পাবে না। তোমার শাস্তি হবে, সবার শাস্তি হবে।"

রিহাও হয়তো জলিলের মতোই কিছু একটা বলে ক্ষমা ভিক্ষা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু জলিলের পরিনতি দেখে মুখে আসা কথাটা আবার ঢক করে গিলে ফেলল। অপরদিকে ফিরোজের মা শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। বারেক কালিয়ান তাকেও রেহাই দিলেন না। তীব্রভাবে কটাক্ষ করে বললেন, "আপনি আবার মুখ লুকাচ্ছেন কেন? কীসের অভাব ছিল আপনার বলুন? রাজ-রাজাদের মতো আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তবুও সুখ সইল না। নিজের ছেলেটাকে ভুল বুদ্ধি দিয়ে বিপথে নিয়ে গেলেন।"

ফিরোজের মা অবাক হয়ে বারেক কালিয়ান এর কথা বলা ছবিটার দিয়ে তাকিয়ে রইলেন, তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না ছেলেকে চুরি করতে রাজি করানোর কথাটাও শিল্পী জেনে ফেলেছেন। ফিরোজও অবিশ্বাসির মতো হা করে তাকিয়ে রইল।

বারেক কালিয়ান বলে চললেন, "কি ভেবেছিলেন, বুঝতে পারব না, তাই না? একটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনাদের যদি দুটো করে চোখ আর কান থাকে তা হলে আমার হাজারটা চোখ আর কান। আমি সব দেখতে পাই, সব শুনতে পাই। তাই আমার থেকে কোনও কিছু গোপন করার চেষ্টা করে রেহাই নেই।"

ফিরোজ লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল, মায়ের কথা শুনে যে ভুল করেছে সেটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে শয়তানটা। সেই সাথে বিশ্বাসঘাতকতার একটা দায়ভার এসে পড়াতে মাথা উঁচু করে আর শিল্পীর চোখে চোখ রাখতে পারছে না।

এবারে বারেক কালিয়ান সরাসরি রিহার দিকে তাকালেন, "আর তুমি! তোমাকে ভাল ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি যেটা করেছ সেটা খুবই জঘন্য। কীভাবে পারলে! স্বার্থের জন্য কতটা নিচে নামতে পারো সেটা আজ বুঝেছি। তুমি শুধু ফিরোজদের সাথে হাত আর খাবারে ঘুমের ওষুধই মেলাও নি, বরং অর্থের লোভে নিজের সম্ভ্রম পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা করনি! তোমার মতো অর্থ লোভী মেয়ে ভয়ংকর। সত্যিই মানুষ চিনতে ভুল করেছিলাম, মস্ত ভুল। তোমাকে একটা ভাল মেয়ে ভেবে বাসার কাজে রাখাটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলগুলোর একটা! তবে এর শাস্তি তুমি পাবে, তোমার নিস্তার নেই, কারও নিস্তার নেই।"

রিহার অবস্থা দেখে মনে হলো সে পারলে লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাবে, তবে বারেক কালিয়ান এর কথা শুনে যা মনে হচ্ছে তাতে শাস্তির ব্যাপারটাতে তিনি যথেষ্ট দৃঢ়। কী শাস্তি তার মাথায় ঘুরছে কে জানে! প্রানে না মেরে ফেললেই হয়!

BanglaBook.org

রঞ্জন কৌতূহলি হয়ে জানতে চাইল, "আমাদের চুরির প্ল্যানটা আপনি কীভাবে ধরতে পারলেন?"

"তোমরা দিনের পর দিন আমার বাসাতে নজর রাখবে, আর আমি বুঝতে পারব না সেটা কী করে ভাবলে? তোমাদের কি ধারণা, চিত্রশিল্পী হলেই সে খুব বোকা প্রকৃতির, শান্ত, ভালমানুষ, পাগলাটে গোছের কেউ হয়? একদম না। মাঝে মধ্যে দুই একজন বুদ্ধিমানও থাকে। তোমরা ভুল ঘরে চুরি করতে এসেছ, বোকামি করেছ," উত্তর দিলেন শিল্পী।

আমিও প্রশ্ন করে বসলাম, "কিন্তু আজকের দিনেই যে আসব সেটা কীভাবে নিশ্চিত হলেন?"

বারেক কালিয়ান ঘর কাঁপানো হাসি দিয়ে বললেন, "হা-হা-হা...বলেছি না, আমার হাজারটা কান, হাজারটা চোখ। আমি সব দেখি, সব শুনি, সব বুঝি। আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই! "

হতাশায় দুই কাঁধ ঝুলিয়ে দিলাম। শিল্পী এতটা চালাক হবেন সেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। শুধু আমি কেন, ফিরোজ কিংবা রঞ্জনের মতো বুদ্ধিমান লোকও সেটা বুঝে উঠতে পারেনি আগেভাগে। পারলে হয়তো ভুলেও চুরির কথা মাথায় আনতো না।

দেখলাম কাল্লুও তার আধবোজা চোখ খানিকটা খুলে শিল্পীর কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছে, ওর অবস্থা এখন আরও খারাপ মনে হলো। বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। রক্তে পায়ে লাগানো গেঞ্জিটা এখন পুরোপুরি ভিজে গেছে।

শুমেল আমতা আমতা করে বলল, "কিন্তু ঘরের ভিতরে কে কী করছে সেটা জানলেন কীভাবে? আমরা তো ক্যামেরা থেকে অনেকটা দূরে থাকার চেষ্টা করেছি।"

আমিও এটা নিয়ে ভাবছিলাম, কন্ট্রোল রুম থেকেও আমাকে ক্যামেরাতে দেখতে পায়নি, কিন্তু বারেক কালিয়ান বলছেন তিনি সব দেখেছেন সব শুনেছেন, কী করে সেটা সম্ভব!

কঠিন চোখে শুমেলের দিকে তাকালেন শিল্পী, "বোকা কোথাকার!" বললেন, "তোমরা ভেবেছে কেবল ওই কয়টা ক্যামেরা দিয়েই সব কিছুর উপর নজর রাখা হচ্ছে? নির্বোধ! এই বাসার প্রতিটি আয়না, দেয়াল ছবির পেছনে ক্যামেরা লুকানো রয়েছে। তোমরা কখন কী করছ না করছ, কীভাবে করছ সব আমি আমার স্মার্টফোনে বসেই দেখতে আর শুনতেও পাই।

"এরকম স্বল্প বুদ্ধি নিয়ে আবার এসেছে চুরি করতে, ছিঃ!! ধিক্কার তোমাদের।"

শুমেল চুপসে গেল, রঞ্জনও ম্লান হয়ে যাওয়া বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শিল্পীর জীবন্ত ছবিটার দিকে।

BanglaBook.org

পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করার জন্য বললাম, "তা হলে আর কী! ধরেই ফেললেন। এবার নিশ্চয়ই আমাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। না, জীবনে অনেক বড় একটা শিক্ষা হলো, আর কখনও চুরি করব না। পুলিশ খুবই ভয়ংকর, কত বছর জেলের ঘানি টানতে হবে কে জানে!"

কথাটা শুনে সবার মুখ আরও ছোট হয়ে গেল, কেবলমাত্র বারেক কালিয়ান জ্বলে উঠলেন। হুংকার দিয়ে বললেন, "পুলিশ! না কোনও পুলিশ না। এত সহজে তোমরা নিস্তার পাবে না। তোমাদের শাস্তি দেব আমি, নিজের হাতে দেব শাস্তি।"

রিহা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কী শাস্তি?"

"মৃত্যু," হিমশীতল কণ্ঠে জবাব দিলেন শিল্পী।

ঘরের ভেতরে থাকা সবগুলো মানুষ একত্রে আঁতকে উঠল। জলিল হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল, রিহা আতংকে মুখ লুকাল দু-হাতের মাঝে। ফিরোজ আর তার মা চোখে চোখে ভাবের আদান প্রদান করল। শুমেল আর রঞ্জনও দুর্বলভাবে চেয়ারে ঢলে পড়ল, যেন এমন কিছুই একটা তারা ভয় করছিল।

আমি যুক্তি দিলাম, "এটা কোনও বিচার হলো? আপনি চুরির অপরাধে সবাইকে মেরে ফেলবেন? ধরে নিলাম ছবিগুলো দুর্মূল্য, কিন্তু তার দাম কি মানুষের জীবনের থেকেও বেশি? আমাদের একটা সুযোগ দিন, ছেড়ে দিতে হবে না, পুলিশের হাতে তুলে দিন। ভবিষ্যতে আর আপনার সম্পদের দিকে নজর দেব না, কখনও না!"

সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। কিন্তু শিল্পী মেনে নিলেন না। ঠোঁটে ক্রুর হাসি ফুটিয়ে বললেন, "নাহ, ক্ষতিটা সম্পদের নয়, সম্মানের। তোমাদের যদি পুলিশের হাতেও তুলে দেই তাহলে পুরো পৃথিবী জেনে যাবে আমার ছবিও চুরির চেষ্টা করা সম্ভব। তখন আরও হাজারটা চোর এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। তাই তোমাদের এই শাস্তির ব্যবস্থা। তবে আমি অবিচারী না, তোমাদের বাঁচার সুযোগ অবশ্যই দেব। সেটা কাজে লাগাতে পারলে হয়তো বেঁচেও যেতে পারো। আর না পারলে, নির্ঘাত মৃত্যু।"

সবাই এক সুরে জিজ্ঞেস করলাম, "কী সুযোগ?"

এই কথার উত্তর দেবার আগে বারেক কালিয়ান হাতে ধরা রিমোট কন্ট্রোলের একটা বোতাম টিপলেন। সাথে সাথে টেবিলের ধারের কিছুটা ছেড়ে ভেতরে একটা বড় গর্ত তৈরি হয়ে গেল। সেখান থেকে কয়েকটা জিনিস যন্ত্রের উপরে উঠে এল। জিনিসগুলো উপরে ওঠা বন্ধ হতেই টেবিল আবার আগের মতই মসৃণ হলো। দেখে বোঝারই কোনও উপায় রইল না যে ওগুলো আগে থেকে ওখানে রাখা ছিল না!

টেবিলের কেন্দ্রে এখন একটা ছোট্ট কাঁচে ঢাকা সুরক্ষিত বাক্স শোভা পাচ্ছে। আর ধার ঘেসে কয়েকটা পিস্তল, ধারালো ছুড়ি পাশাপাশি সাজানো। ঘরের আলোয়

BanglaBook.org

সেগুলো ঝকমক করছে। কেউ অবশ্য পিস্তলে হাত দেবার সাহস করল না, শিল্পী অসন্তুষ্ট হতে পারেন ভেবে।

বারেক কালিয়ান বলে চললেন, "তোমাদের বাঁচার দুটো সুযোগ দেব। প্রথম সুযোগটা যদি কাজে লাগাতে পারো তাহলে সবাই বাঁচবে। আর যদি সেটা কাজে না লাগাতে পারো তা হলে বাঁচবে শুধুমাত্র একজন। সেই একজন কে হবে সেটা নির্ভর করবে তোমাদের হিংস্রতার উপর।"

"ওই যে টেবিলের মাঝখানে কাঁচের বাক্সটা দেখছ, ওটার নিচেই আছে প্রথম সুযোগ। তোমরা চোর, আমার ধারণা এই সুযোগটা একজন পাকা চোরের পক্ষেই কাজে লাগানো সম্ভব। ওখানে একটা কি-হোল দেখতে পাবে, সেটার ভেতর দিয়ে যদি তোমরা একটা তালা খুলে ফেলতে পারো তাহলে এই ঘরে একটা দরজা খুলবে। দরজাটা দিয়ে সবাই চলে যেতে পারবে।

"আর যদি সেটা না পারো তবে তোমাদের জন্য থাকছে দ্বিতীয় উপায়, একজন বাঁচার উপায়। সে উপায় কিছুটা কঠিন, কিন্তু তোমাদের মতো হৃদয়হীন মানুষদের জন্য সেটাও একটা ভাল পছন্দ হতে পারে। উপায়টা হয়তো বুঝে গেছ এতক্ষণে, টেবিলের উপর অস্ত্রগুলো দেখে। হ্যা, এই অস্ত্রগুলো দিয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, হত্যা করতে হবে বাকিদের, আর নিজের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে তুলতে হবে। সবশেষে যে বেঁচে থাকবে আমি তাকে দরজা খুলে মুক্ত করে দেব। একজনের বেশি মুক্তি পাবে না, কোনওভাবেই না।"

রঞ্জন বাঁধা দিলো, "এ নির্মমতা, অসুস্থতা, আপনি একজন অসুস্থ মানুষ। আপনি মানুষ না, আপনি আসলে একটা পিশাচ, নর-রূপী শয়তান!"

আবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন বারেক কালিয়ান, "হা-হা-হা...ঠিক ঠিক...আমি শয়তান, আমি পিশাচ, আমি তোমাদের ছেড়ে দেব না! কিন্তু এটা তো চুরি করতে আসার আগে ভাবা উচিৎ ছিল, তাই না রঞ্জন সাহেব?"

ফিরোজ আর রিহ্যও কাকুতি করে উঠল, "স্যার, আমাদের ছেড়ে দিন, এরকম ভুল আর কোনোদিন হবে না, আমরা এই শহর ছেড়ে চলে যাব, আর এখানে আসব না, ছেড়ে দিন স্যার, যেতে দিন।"

দৃঢ়ভাবে বারেক কালিয়ান বললেন, "মুক্তির উপায় তো বলেই দিলাম। চোর, চুরি বিদ্যা কাজে লাগিয়ে বাঁচার চেষ্টা কর। জীবনে যা কিছু করবে মাথা তুলে করবে, আধা-আধি কাজ কখনও করবে না। আধা-আধি কাজ করলে এই বারেক কালিয়ান আজ এত বড় শিল্পী হতে পারতো না, বুঝলে?

তবে হ্যা, তালাটা খোলার জন্য অফুরন্ত সময় তোমরা পাবে না। আমার হাতে অনেক কাজ রয়েছে, তোমাদের নিয়ে সারাদিন বসে থাকার উপায় নেই।

আমার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই ঘরের চারদিক থেকে সাদা গ্যাস ছাড়া

BanglaBook.org

হবে। গ্যাসটা নিঃশ্বাস নেওয়া মাত্রই কেউ মরবে না ঠিকই, তবে বেশিক্ষণ নিঃশ্বাস নিলে এটা মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। আমার হিসেবে মানুষের ফুসফুসের কথা বিবেচনা করে কমবেশি এক ঘন্টার মত যদি সেই গ্যাস নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহন করা হয়, তা হলে মৃত্যু অনিবার্য। ধরে নাও তোমাদের সময় এই এক ঘন্টা। এরমধ্যে যদি সবাই উদ্ধার পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পার তো ভাল, আর যদি না পার তা হলে যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে তাকে আমি নিজে মুক্ত করে দেব। কিন্তু যদি দুটোই করতে ব্যর্থ হও তবে কাউকেই মুক্তি দেব না, সবাই গ্যাসের প্রভাবে মরবে।

"কি, সব তথ্য পরিষ্কার? গুড, তা হলে তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন।"

কেউ কিছু বলার আগেই বারেক কালিয়ান রিমোট কন্ট্রোলটের আরেকটা বোতাম টিপলেন। সাথে সাথে ঘরের চারদিক থেকে ঘন সাদা গ্যাস ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

BanglaBook.org

বর্তমান কথা
রাত ০২ : ৫৭

পাঁচ মিনিট আগেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্তটা পাকাপাকি করে ফেলেছি। কীভাবে করব সেটাও ভেবে ফেলেছি। মিনিট দশেক আগেই আমার আছাড় মেরে ভেঙে ফেলা গ্লাসটা এখন মাটিতেই পড়ে রয়েছে, সেটার লম্বা ধারাল এক টুকরো দিয়েই কাজটা করা হবে। টেবিলের উপর কিছু ছুড়ি এবং বন্দুক পড়ে আছে, চাইলে সেগুলো ব্যবহার করা যেত, কিন্তু তাতে নাটকীয়তা কিছুটা কম হতো। আত্মহত্যার গুরুত্ব বাড়ে সেটা কতটা নাটকীয় তার উপর, নাটকীয়তা না থাকলে আত্মহত্যাও গুরুত্বহীন। আমি চাই না জীবনের সবথেকে কষ্টসাধ্য কাজটা গুরুত্বহীন হয়ে থেকে যাক! সুতরাং, ওই ভাঙা গ্লাসের টুকরো দিয়ে কাজটা সমাধা করব। লম্বা টুকরোটা আমি বুকের ঠিক বামদিকে হৃদপিণ্ডের কাছাকাছি জায়গাতে বসিয়ে দেব, তাতে রক্তে আমার গেঞ্জি ভিজে উঠবে আর সেটাই মৃত্যুটা স্মরণীয় করে রাখবে।

সমস্ত ঘরটা এখন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, মাথা ঘুরপাক খাচ্ছে। সম্ভবত শিল্পী ঠিকই বলেছিলেন, আমাদের কারও পক্ষে এই গ্যাসের মধ্যে এক ঘণ্টার বেশি নিঃশ্বাস নেওয়া সম্ভব না। এর বেশি হলেই মৃত্যু অনিবার্য। আপাতত কেউ সেটা নিয়ে ভাবছে না, তারা ভাবছে হয়তো টেবিলের উপরে থাকা লকটা কোনোভাবে খুলে ফেলা সম্ভব। সেই আশা নিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমনকী বারেক কালিয়ান স্বয়ং আমাকে বড় বড় চোখ করে দেখছেন তার লাইভ ভিডিও ছবির মধ্যে দিয়ে।

তারা কীভাবে জানতে পারলো আমি তালা খুলতে পটু সেটা বলাই বাহুল্য, রঞ্জন বিষয়টি তাদের কাছে ফাঁস করে আমাকে এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। তবে তালা খোলার চেষ্টা যে আমি করিনি তা-না। সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি, বার বার করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি তাতে।

প্রথমেই যখন গ্যাস ঢোকা শুরু হলো তখন সবাই দিশেহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সেই কাঁচের ছোট বাক্সটার উপর। জলিল এক বাড়ি মেরে কাঁচের আস্তরণটা ভেঙে ফেলেছিল। তারপর একে একে নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সেটা খোলার চেষ্টা করে যথাক্রমে রিহা, জলিল এবং সবশেষে ফিরোজের মা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না তালার। এরপর ফিরোজ তার পকেট থেকে ঘরের চাবির গোছাটা বের করে একটার পর একটা চাবি দিয়ে সেই তালাটা খোলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতেও সুবিধে হলো না। কোনও চাবি ভেতরে গিয়ে ঘুরল না,

BanglaBook.org

দরজাও খুলল না। ঠিক তখনই রঞ্জনের মাথাতে এল শিল্পীর বেডরুম থেকে উদ্ধার করা চাবিটার কথা, যেটা ব্যবহার করে আমি কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এই মৃত্যু খাঁচায় উপস্থিত হয়েছি। ওখানে থাকলে কমপক্ষে ছয় সাত দিন খেয়ে বাঁচা যেত! এখানে আয়ু আর মাত্র কয়েক মিনিট। মানুষের দুর্ভাগ্য অজান্তেই নিজের খুব কাছে চলে আসে।

চাবিটা বের করে দিতেই ওটা দিয়েও বিস্তর চেষ্টা করা হলো। বারণ করেছিলাম ওটা ব্যবহার করতে, কারন ওই চাবিতে পাঁচটা মাথা, আর এই তালার মাথা কেবল একটা, সুতরাং সাধারণ বুদ্ধি বলে এই চাবি দিয়ে ওই তালা খোলা সম্ভব নয়। কিন্তু এসব কথা কেউ কানে তোলেনি। তা নাইবা তুলল, তাতে লাভ তো কিছুই হলো না উল্টো কয়েক মিনিট সময় বরবাদ হলো। রিহা ক্ষেপে গিয়ে ওটা আমার মুখের উপরেই ছুঁড়ে মেরেছিল, অল্পের জন্য চোখে না লেগে চোখের নিচে লেগেছে। জায়গাটা ব্যথায় টনটন করছে।

গ্যাসের প্রভাবেই হোক আর প্রচণ্ড মানসিক চাপেই হোক, গত মিনিট কুড়ি যাবৎ কারও মাথার ঠিক নেই। রঞ্জনও এখন ঠিকমত তার বুদ্ধি কাজে লাগাতে পারছে না, পারলে সে আমাকে তালা খোলার জন্য অমনি করে কড়া ভাষায় আদেশ দিত না, ভদ্রভাবে বলতো।

ওর বাজে ব্যবহার গায়ে মাখিনি। বাঁচার সম্ভাবনা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ালে মানুষ যে নিজের স্বভাবের বাইরে গিয়ে মরিয়া হয়ে উঠতে পারে। আগে ধারণা ছিল না, আজ হাড়ে হাড়ে বুঝলাম।

রঞ্জনের কথা শুনে যখন ফিরোজ, রিহা, ফিরোজের মা, জলিল জানতে পারলো আমার গুণের কথা সাথে সাথেই তাদের ভাবমূর্তিই পাল্টে গেছে। ওরা এখন আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখছে। রিহা তো পারলে তখনই আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়! জলিল পা জড়িয়ে ধরেছিল। ফিরোজ আর ওর মা বিগলিত ভাব নিয়ে তখন থেকে তাকিয়ে আছে। এত কিছুর মধ্যে একমাত্র ভাবলেশহীন রয়েছে কাল্লু, ওর শরীর আরও দুর্বল লাগছে, তাই উত্তেজনার কিছুই অনুভব করতে পারছে না। চেতন-অচেতন এর মাঝামাঝি ঝুলে রয়েছে বেচারা। ওর জন্য মায়া হচ্ছে, যদি গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় তা হলে সর্বশেষ মানুষ হিসেবে ওর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক কম। অথচ সুস্থ সবল থাকলে ও-ই হতে পারতো একমাত্র লোক যে সবাইকে মেরে দিয়ে জীবিত এখান থেকে বেরিয়ে যেত। হতভাগার মন্দ কপাল।

আর মাত্র বিশ মিনিট বাকি বারেক কালিয়ানের বেঁধে দেওয়া সময়ের। রঞ্জনের আদেশে তালাটা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, সুবিধা করতে পারিনি। তালাটা

BanglaBook.org

বিদঘুটে, অনেক ঝামেলা করে তৈরি করা, মূল চাবি ছাড়া এই তালা খোলা সম্ভব না। চাবিটা বোধহয় শিল্পীর কাছেই আছে। অথবা কোনও চাবিই নেই! হাতে ধরা রিমোট কন্ট্রোলের একটা বোতামই কেবল ঘরের দরজা খুলতে পারবে! আমার ধারণা এভাবে তালা খুলতে বলার বুদ্ধিটা শিল্পী করেছেন আমাদেরকে মৃত্যুর আগেই হতাশার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য। হতাশ হয়ে মৃত্যু হচ্ছে নিকৃষ্টতম মৃত্যু। নিজের উপরে মায়া একদম থাকে না হতাশ ব্যক্তির। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মূল বস্তুই হচ্ছে আশা, সেটা চলে গেলে এমনিতেই দেহে প্রাণ থাকে না, বারেক কালিয়ান আমাদের এক বারেই দু'বার মারতে চাইছেন। ভয়ংকর এক প্রতিশোধের খেলায় মেতে উঠেছেন তিনি, তাকে থামানোর সাধ্য আমার মতো সাধারণ একজন চোরের নেই।

বাম হাতের কনুইটা খুব বেশি টন টন করছে, আর মিনিট দুয়েকের বেশি হেলান দিয়ে থাকা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। তালাটা খুলতে পারব না সেটাও নিজের মুখে ঘোষণা দিতে ইচ্ছে করছে না। সবার আশাতুর দৃষ্টির মাঝে নেমে আসা নিরাশার চাপ সইতে পারব না। তাই দ্রুতই কাজটা সারতে হবে, তাহলেই ওরা বুঝে নেবে কথাটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি কেন।

আমি বন্দুক চালনায় দক্ষ না। গায়েও তেমন জোর নেই, তাই ছুড়ি দিয়ে মারামারি করে ওদের সাথে পেরে উঠব না। তার থেকে এই-ই ভাল। ওরা যা পারে করুক, যে ভাবে পারে করুক, আমি আর এরমধ্যে নেই। আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, দুর্বল, নগণ্য একজন মানুষ, সেভাবেই থাকতে চাই। যে যুদ্ধে জয় নেই, সে যুদ্ধ আমার পক্ষে করা সম্ভব না, আমি করবও না, সেটা ওরাই করুক বরং।

কেউ কেউ হয়তো বুঝতে পারছে আমি কী করতে চলেছি। ওরা কি আমাকে বাঁধা দেবে? কী জানি! দিয়েও লাভ নেই, খুবই দ্রুতই কাজটা করে ফেলব। হয়তো তারপরেই মুক্তি। বহু প্রতিক্ষিত, বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি।

ধোঁয়াটে আলোয় সৃষ্টি হওয়া আবাছায় ঝুঁকে কাঁচের টুকরোটার দিকে হাত বাড়ালাম। ব্যাস, আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরেই সব শেষ, সব...

* * *

টেবিল ঘিরে বসে থাকা সাতজন লোক হতবাক হয়ে দেখল তাদের একমাত্র বেঁচে থাকার ভরসা এইমাত্র হৃদয়হীনভাবে আত্মহননের পথটি বেঁছে নিয়েছে। সে খুব সচেতনভাবে মেঝেতে একটু আগে আছাড়ে ভাঙা কাঁচের গ্লাসের এক টুকরো নিয়ে

BanglaBook.org

দ্রুত বুকের বাম দিকে ঢুকিয়ে দিলো। প্রায় সাথে সাথে পোশাকের উপর তাজা রক্ত একটু একটু করে পুরো ক্ষতটাকে ঘিরে ফেলল। মানুষটা অবশ্য বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না, চেয়ার উল্টে মেঝেতে পড়ে গেলে। দেখতে দেখতে দেখতে মিনিট দুয়েকের মধ্যে তার ছটফট করতে থাকা দেহটা অসাড় আর নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

হিরণ ঢলে পড়তেই প্রেক্ষাপট বদলে গেল। রঞ্জন, শুমেল, জলিল, ফিরোজের মা, রিহা চোর ছিল ঠিকই, তবে জীবনে খুন করেনি দেখে অস্ত্র তুলতে সংকোচ করছিল। ফিরোজের কাছে অস্ত্র আগেই ছিল, সে ডান হাতটা সন্তর্পণে পিস্তলের হাতলে রাখল।

রাহাত অনেকক্ষণ ঘাপটি মেরে ছিল, তার জ্ঞান এসেছে আগেই কিন্তু কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি। একদম সঠিকভাবে বলতে গেলে তার জ্ঞান এসেছে যখন গ্যারাজটা নিচে নামতে শুরু করে তখনই। তবে ঘাপটি মেরে থাকাতে অনেকগুলো সুবিধা হয়েছে, তাকে কেউ হিসেবের মধ্যে ধরছে না। একটা সুযোগ এমনও রয়েছে যে কেউ তাকে খুন করারই প্রয়োজন মনে করল না! কিন্তু সেটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

সে অবশ্য একদম অসহায় নয়, তার কাছে এখন একটা পিস্তল রয়েছে। হ্যা সেই পিস্তলটাই যেটা তার থেকে জলিল কেড়ে নিয়েছিল তাকে অজ্ঞান করে। সেই পিস্তলটাই যেটা তাকে দিয়েছেন বারেক কালিয়ান! বারেক কালিয়ান। তার কাছেই এসেছিল সে, তা আরও তিন মাস আগের কথা। সে-ই বারেক কালিয়ান কে তার দলের গতিবিধি সম্পর্কে খবর জোগাড় করে দিয়েছে। কখন, কীভাবে তারা সব কাজ করবে সব বলেছে নিখুঁত বর্ণনায়। এমনকী এই বাড়িতে কাজের পরিকল্পনার জন্য যে ম্যাপটা শুমেল নিজের হাতে তৈরি করেছে সেটারও একটা ফটোকপি করে দিয়ে এসেছিল তাকে। তার অবশ্য আর কোনও উপায়ও ছিল না, চুরির ব্যাপারটা শিল্পী ধরে ফেলেছিলেন। রাহাতকে হুমকি দিয়েছিলেন, যদি সাহায্য না করে তবে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।

রাহাত অবশ্য স্বীকার করতে চায়নি যে সে চোর, প্রতিবাদ করেছিল, কোনও ফল হয়নি তাতে। শিল্পী কোথা থেকে যেন তাদের সাম্প্রতিক একটা চুরির সচিত্র প্রমাণ জোগাড় করে রেখেছিলেন। সাথে একটা ভিডিও ফুটেজও ছিল। এসব দেখে রাহাত আর মানা করতে পারেনি, রাজি হয়ে গেছিল প্রস্তাবে।

বারেক কালিয়ান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাহাতের কোনও ক্ষতি হবে না। আর এই কাজের জন্য সে অনেক টাকা পাবে, কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু তাদের

BanglaBook.org

দলটাকে এখানে এনে উনি ঠিক কী করতে চান তা তিনি কখনও খুলে বলেননি। রাহাত বেশ কয়েক বার জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি এড়িয়ে গেছেন প্রতিবার, নানা উপায়ে। বার বার দিয়েছেন কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি। যদিও এখন রাহাতের মনে হচ্ছে পুরোটাই মিথ্যে ছিল, এর থেকে আগের চুরির দায়ে দশ বছর জেল খাটলেও ভাল হতো।

যে পিস্তলটাকে এত ভরসা করছে সেটার জন্য শিল্পীকে একবার ধন্যবাদ দিলো রাহাত। ওটা গ্যারাজের মধ্যে কীভাবে আবার তার হাতে এসে পড়েছিল সেটা জানে না, তবে ধারণা করতে পারে। কোনও রকম ধস্তা ধস্তির কারনেই বেহাত হয়ে তার কাছে এসেছিল সেটা, পরে আর কেউ খেয়াল করেনি। এই ব্যাপারটা আন্দাজ করেছে কাল্লুর পরিনতি দেখে, ওকে যখন এই ঘরে নিয়ে আসা হয়ে তখন চোখ একটু ফাঁকা করে খুব সাবধানে কাল্লুর অবস্থাটা দেখতে পেয়েছিল। দেখে খুব খারাপ লেগেছিল ওর, কিন্তু কী-ই বা করবে, পৃথিবীতে নিজের থেকে বড় কিছুই নেই, আগে নিজেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে রয়েছে। ঘড়িতে আবাছাভাবে রাহাত দেখতে পেল বেঁধে দেওয়া সময়ের আর মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে। সময় যে খুব কম সেটা ঘড়ি না দেখলেও বেশ বুঝতে পারছিল। কেননা নিঃশ্বাস নিতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। অপরদিকে টেবিল ঘিরে বসে থাকা সাত জন মানুষ অনড়, তারা কি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়? তাদের কি নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না? তারা কি বিষাক্ত হওয়াতে নিঃশ্বাস নিতে নিতেই মৃত্যু বরণের প্রক্রিয়াটিকে বেছে নিয়েছে? রাহাত ভেবে কূল পায় না। তার সহ্যের সীমা প্রায় শেষ প্রান্তে, এবার তাকেই কিছু একটা করতে হবে, নিজের মুক্তির জন্য তাকেই অগ্রসর হয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে, এখনই নিতে হবে সেই পদক্ষেপ!

রাহাত ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, ঘন ধোঁয়ায় কেউ তাকে লক্ষ্য করল না। প্রথমেই সে তাক করে গুলি চালাল জলিলের দিকে। প্রচণ্ড শব্দে পুরো ঘর কেঁপে উঠল। অব্যর্থ গুলি, জলিলের গলায় লাগতেই সে টেবিলের উপর আছড়ে পড়ল, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে চলল। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই মুহূর্তেই সতর্ক হলো, ঝাঁপিয়ে টেবিল থেকে এক একটা অস্ত্র তুলে নিল। এমনকী কাল্লুও কোথা থেকে যেন গায়ে অসীম শক্তি পেয়ে গেল। সে টেবিলে পড়ে থাকা একটা ছুড়ি আয়ত্ত করে সেটা দিয়ে এলোপাথাড়ি ফিরোজের মা-কে আঘাত করে চলল। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধমনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মহিলা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

ঘটনাটা এতো দ্রুত ঘটল যে ফিরোজ সামলে উঠতে পারল না। রাহাতের

BanglaBook.org

দ্বিতীয় গুলিটা তাকে লক্ষ্য করে ছিল, সেটা কাটাতেই তাকে মাথা নিচু করেছিল ফিরোজ। মাথা তুলতেই আবিষ্কার করল মায়ের লাশ। কালুর হাতে রক্তাক্ত ছুড়ি দেখে বুঝতে সমস্যা হল না তার মা-কে কে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পিস্তলটা দিয়ে পর পর অনেকগুলো গুলি কালুর মাথার এপাশ ওপাশ করে দিলো ফিরোজ। মাথাটা চৌচির হয়ে গেল, বিস্ফোরণে মগজ বেরিয়ে এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল। প্রায় সাথে সাথে মৃত্যু বরণ করল বিশালদেহী মানুষটা।

পরবর্তি গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে রাহাত সামান্য হতাশায় ভুগছিল। সবাই অস্ত্র তুলে নিয়েছে হাতে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে তার উপর আক্রমন আসবেই, বেশ বুঝতে পারছিল। এর পর কাকে গুলি করবে সেটা ঠিক করতে না পেরে রঞ্জনের দিকেই আচমকা গুলি ছুঁড়ল সে। গুলিটা রঞ্জনের পায়ে লাগল। রঞ্জন চেয়ার থেকে নিচে পড়ে গেল। একটা ডিগবাজি দিয়ে টেবিলটা থেকে সামান্য দূরে সরল সে, তারপরে রাহাতের দিকে গুলি চালাল। পায়ের যন্ত্রণার কারণে হাত কাঁপায় সেই গুলি লক্ষ্য ভেদ করতে পারল না। রাহাতের অবস্থা তার বেশ কিছুদিন ধরেই নড়বড়ে মনে হচ্ছিল, ভেবেছিল এই মিশনের পরেই ওকে দল থেকে বাদ দিয়ে দেবে। আপাতত সেই অপেক্ষাটুকু করার ধৈর্যও অবশিষ্ট নেই রঞ্জনের। উপরন্তু তার উপরে গুলি করে রাহাত প্রমাণ করে দিয়েছে সে নিজেকে বাঁচাতে সব করতে পারে।

রঞ্জন আবার গুলি করলো, কিন্তু রাহাত লাফিয়ে সরে যাওয়ায় সেটা গায়ে লাগল না।

ওদিকে সবাই যখন অস্ত্র কাড়াকাড়ি করতে ব্যস্ত তখন রিহাও একটা ছুড়ি তুলতে পেরেছিল কোনোভাবে। সে সহসাই হাতের ছুড়িটা শুমেলের পেটে বসিয়ে দিলো, তারপর সেটা পাগলের মতো টানতে টানতে তুলে আনল বুক পর্যন্ত।

শুমেল আচমকা আক্রমন একদমই আশা করেনি রিহার থেকে। এসব খুন-খারাবিতে নাক গলাতে চায় না দেখে এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল বেচারা। তবে আত্মরক্ষার কথা ভেবে হুটোপুটির সময় একটা পিস্তল সেও তুলেছিল। পিস্তল কীভাবে চালাতে হয় জানে না শুমেল। মরিয়া হয়ে পিস্তলটার বাঁট দিয়ে মাথায় মেরে রিহাকে থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, রিহার ছুড়িকাঘাতে তার শরীরের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধমনী বিচ্ছিন্ন হয়েছে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে শুমেল যারপরনাই দুর্বল হয়ে পড়ল। এই সুযোগটাই নিল রিহা, সে শুমেলকে ধাক্কা মেরে চেয়ার থেকে নিচে ফেলে দিলো। তারপর ওর বুকে চেপে ক্রমাগত হৃদপিণ্ডে ছুড়ি দিয়ে আঘাত করে চলল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে প্রাণটুকু শুমেলের দেহ ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমাল।

BanglaBook.org

রিহা সেখানেই থেমে রইল না, সে হামাগুরি দিয়ে রঞ্জনের দিকে এগুতে থাকল। রঞ্জন রাহাতের সাথে গোলাগুলিতে ব্যস্ত তাই খেয়াল করল না। যদি টেরও পায়, তার আগেই ছুড়ি দিয়ে তাকে শেষ করে দিতে পারবে এই বিশ্বাস রিহার আছে নিজের উপর। আত্মবিশ্বাসটুকু সে মিনিট খানেক আগেই একজনকে খুন করে অর্জন করেছে। খুন করার মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে এটা আগে জানত না রিহা, এখন বুঝেছে। আর কেউ তাকে থামাতে পারবে না, সে একাই পারবে বেঁচে থাকা সবগুলো মানুষকে নীরবে শেষ করে দিতে, পারতেই হবে!

রাহাত দেখল রঞ্জনের মতো এখন ফিরোজও তার দিকে গুলি চালাতে শুরু করেছে, সে আবার একটা চেয়ারকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে ফিরতি গুলি-গুলোর হাত থেকে বাঁচার জন্য। সেজন্য রাহাতের গুলি বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে কিছুক্ষণ আগেই রঞ্জনের করা একটা গুলি রাহাতের পেটে এসে লেগেছে। যদিও বেরিয়ে গেছে, কিন্তু রক্তপাত হচ্ছে বিস্তর, তাড়াতাড়ি অবস্থা আয়ত্তে না আনতে পারলে কিছুক্ষণের মধ্যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেই সে মারা যাবে। দিশেহারা হয়ে রাহাত সামনের ছুটল, এঁকেবেঁকে।

রাহাতকে দৌড় লাগাতে দেখে রঞ্জন আর ফিরোজ দু'জনেই খানিকটা থতমত খেল। ফিরোজ ঠিকভাবে নিশানা করতে পারল না।

ততক্ষণে রঞ্জনের উপর অন্য ঝামেলা এসে পড়েছে। রিহা, তার পিঠে এইমাত্র ছুড়ি বসিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা কখন এখানে এসে পড়েছে সে বুঝতেও পারেনি! কোনও মতে ঘুরে দেখল মেয়েটা তাকে গলা টিপে ধরতে ঝুঁকে পড়েছে। তার হাতের ছুড়িটা অবশ্য এখন রঞ্জনের পিঠেই গেঁথে রয়েছে, সে চিত হতেই ওটা আরও কতকটা ভেতরে ঢুকে গেলে মেঝের সাথে ধাক্কা লেগে। রিহার আঙুলগুলোও তার গলার উপর আরও শক্ত করে চেপে বসল। রিহার ওজন তার শরীরের উপর বসে যাচ্ছে ক্রমাগত। খুব দ্রুতই ছুড়িটা তার ফুসফুস ফুটো করে দিলো। বাতাসের জন্য রঞ্জনের প্রাণ হাঁসফাঁস করল।

রঞ্জনের চেতনা হারিয়ে যেতে শুরু করলো, তবে কি সে মারা যাচ্ছে? হ্যা, তাই-ই হবে হয়তো। মৃত্যুতত্ত্ব নিয়ে একটা বই পড়েছিল সে, এখন মনে হচ্ছে লেখকের মৃত্যু চেতনা ভুল ছিল সেখানে। যন্ত্রণার তীব্রতাটা লেখক সঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। রঞ্জন বেঁচে ফিরতে পারলে হয়তো লিখতে পারতো! সেটা সম্ভব নয়, তার নিঃশ্বাস ক্রমেই আটকে আসছে। শেষ শক্তিটুকু দিয়ে রঞ্জন রিহার কপালে পিস্তলটা ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিলো।

মুহূর্তে রিহার মৃত দেহটা রঞ্জনের শরীরের উপর আছড়ে পড়ল। ধাক্কা লেগে

BanglaBook.org

ছুড়িটা পুরোপুরি রঞ্জনের শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলো। রঞ্জনও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

রাহাত বুঝল রঞ্জনের খেল খতম হয়েছে। প্রায় এক মিনিট তার দিকে কোনও গুলি চলেনি ওদিক থেকে, তবে ওকে কে মেরেছে সেটা বুঝতে পারল না। ফিরোজ এখনও তার দিকে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্য ভেদ করতে পারছে না। এটাই রাহাতের একমাত্র সৌভাগ্য, লোকটার বন্দুকে আরও কয়টা গুলি আছে কে জানে! রাহাতের বন্দুকে আর বেশি গুলি নেই, মোটে তিনটা বাকি, তাই অনেক হিসাব করে গুলি চালাতে হচ্ছে।

ফিরোজ টের পেল রাহাত দৌড়াতে দৌড়াতে অনেকটা কাছে চলে এসেছে। বুঝল চেয়ারের পেছনে লুকিয়ে থেকে আর লাভ হবে না। তার উপরে গুলিও ফুরিয়ে আসছে! সুতরাং, আড়াল থেকে বেরিয়ে সরাসরি রাহাতকে গুলি করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

একটা ডিগবাজি দিয়ে চেয়ার পেরিয়ে সামনের দিকে এল ফিরোজ।

যেন এরকম একটা কিছুর জন্যই প্রস্তুত হয়ে ছিল রাহাত! একটু আগেই টেবিলের ধার ঘেঁসে শুয়ে পড়েছিল সে, হাতে উদ্ধত বন্দুক, সামনে তাক করা। ফিরোজ ডিগবাজি দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের মতো তার অস্ত্রের মুখে এসে পড়ল। তিনটা গুলির সবগুলো খরচও করতে হল না রাহাতকে, শুধু মাত্র একটা গুলি সে ফিরোজের মুখ বরাবর করল। সেটা ফিরোজের নাক ভেদ করে ঘাড়ের পেছন দিয়ে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরোজ একটা গুলিও করার সুযোগ পেল না, তার আগেই অক্কা পেল।

জলিল মৃত্যুর শেষ কয়েকটা মুহূর্ত গুনছিল। পৃথিবীর উপর তার ভীষন ক্ষোভ, জীবনে সে কী-ই বা পেল সে? মুখরা বউ, সামান্য কিছু টাকা মাইনে, হোক না সেটা তার আগের চাকরির থেকে পাঁচ গুণ বেশি, কিন্তু এ বাড়ির সকলের তুলনাতে সেটা নিতান্তই কম ছিল। চুরিতে ভাগ বসিয়ে একটু সুখের মুখ দেখবে ভেবেছিল, কিন্তু সেটাও হলো না। নিজের ভাগ্যর উপর খুব রাগ হচ্ছিল তার। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার যুদ্ধেও একটা সমান সুযোগ সে পেল না। টেবিলের উপর পড়ে থাকা একটা বন্দুক হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। ওটা কেমন আবাছা দেখা যাচ্ছে। ওটা কি স্বপ্নে দেখছে নাকি বাস্তবে? নাকি সে আসলে মৃত? হিসাব মেলাতে পারে না জলিল। যদি স্বপ্নই হবে তাহলে এই টেবিলটাকে কেন দেখছে সে? আরও ভাল কিছুও তো দেখতে পারতো? গোধূলি আলো ছড়ানো লাল আবাছা সূর্য! কিংবা হাসি হাসি মুখ করে খেলা করতে থাকা দু-তিনটি ছেলে মেয়ে, যারা তাকে থেকে থেকে বাবা বলে

BanglaBook.org

ডাকবে। বাবা হবার সাধ তার অনেকদিনের, কিন্তু বউ এই বিষয়ে কখনও সুখী করতে পারেনি। কেন পারেনি? কেন সব দুর্ভাগ্যগুলো তার কপালেই এসে জোটে, সে জানে না। তার আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। সম্ভবত সে এখনও মরেনি তাই তার দুর্ভাগ্যগুলো এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। না এভাবে চলতে দেয়া যাবে না! তাকে মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি পেতেই হবে। নিজের হাতেই সে নিজেকে মুক্তি দেবে!

জলিল টেবিল থেকে পিস্তলটা তুলে নিজের মাথায় ঠেকাল। হাত কাঁপছে তার। শুধু একটা গুলি, সে কি পারবে সেটা করতে? সে কি পারবে নিজেকে মুক্তি দিতে?! আত্মহত্যা এত কঠিন কেন? কেন মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচার সাধ হয়? কেন সে ট্রিগারের উপর চাপটা আরও মজবুত করতে ভয় পাচ্ছে? কেন??

আত্মহননের থেকে আর একটা মাত্র ট্রিগার চাপের ব্যবধানে থেকেই জলিল টেবিলের ওপাশে একটা অবয়ব দেখতে পেল। কে ওটা? খুব চেনা চেনা লাগছে! ঠিক মনে করতে পারল না। তার মাথার মধ্যে কে যেন বার বার বলছে ওই লোকটার দিকে গুলি চালাতে, কিন্তু কেন? সে জানে না, জানতে চায়ও না। কী লাভ জেনে? নিজেকে মারার থেকে অন্যকে মারা সহজ, সুতরাং সেই চেষ্টাই করবে সে, অবশ্যই করবে।

রাহাত উঠে দাঁড়িয়েছে, তার মুক্তির সময় সন্নিকট, সবাই এখন মৃত। সে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। বারেক কালিয়ান যদি একটা কথাও ঠিক বলে থাকে তা হলে সে মুক্তি পাবে। মুক্তিই তার প্রাপ্য, নিজের জীবনকে বাজি রেখেছে সে এর জন্য। টেবিলের কাছে গিয়ে সেটা ধরে নিজেকে স্থির করল রাহাত, জখম থেকে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। সেখানে একটা রুমাল চাপা দিয়েছে, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হচ্ছে না। রক্ত ঝরেই যাচ্ছে, একটু একটু করে। সে দেয়ালের উপর ভেসে থাকা বারেক কালিয়ান এর প্রতিচ্ছবির দিকে চোখ রাখাল। তার চোখে এখন আত্মবিশ্বাস, সেই আত্মবিশ্বাস কি পড়তে পারছে ছবিরূপি বারেক কালিয়ান?

জলিল গুলি চালাল- একটা, দুটো, তিনটা, চারটা, পাঁচটা। তার শরীরের আর গুলি চালানোর মতো শক্তি অবশিষ্ট নেই, দম ফুরিয়ে এসেছে। ঘরের সাদা ধোঁয়োটাও তার ফুসফুসকে গ্রাস করে ফেলেছে। এত কষ্ট কেন মৃত্যু! আসলেই কি কষ্ট! নাহ, জলিল আর কষ্ট অনুভব করছে না, তার শরীরের যন্ত্রণা ছাপিয়ে প্রশান্তির আভা ছড়িয়ে পড়ল মুখে। চেহারায় ফুটল স্বস্তির হাসি। অবশেষে তার মুক্তি হচ্ছে, চির মুক্তি।

শিল্পী বারেক কালিয়ান মনিটরে দেখতে পেলেন সর্বশেষ বেঁচে থাকা

BanglaBook.org

ছেলেটাকে। ছেলেটা রাহাত। একেই তিনি হাত করেছিলেন রঞ্জনদের দলটাকে বন্দি করার জন্য। বেশ কিছু টাকা দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু গাধাটা যে মরতে ওই গ্যারাজের মধ্যে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বে সেটা কে বুঝছিল! অনেক সময় বড় বড় পরিকল্পনাতেও কিছু না কিছু গড়বড় হয়েই যায়। রাহাতকে তিনি বলেছিলেন ওখানে না থাকতে। বলেছিলেন, পিস্তল দেখিয়ে ওদেরকে গ্যারাজের মধ্যে রেখে বাইরে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু গাধাটা সেটা করতে পারেনি, উল্টে নিজেই গিয়ে পড়েছে ঝামেলার মধ্যে।

ফিরোজদের ব্যাপারটা তিনি অবশ্য আগেই ধরতে পেরেছিলেন, ঘরের সবার উপর কড়া নজরদারির অভ্যাস আছে বলেই। একজন গোয়েন্দা পুলিশও বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেকদিনের বিশ্বস্ত লোকদেরকে এভাবে শায়েস্তা করার ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু মানুষের লোভ, অত্যন্ত খারাপ। ওরা উল্টো ওই গোয়েন্দা পুলিশকে সরিয়েই চুরিটা করার প্ল্যান বানাল। কিন্তু ওদের সব কথাবার্তা, পরিকল্পনা যে তিনি গোপনে শুনতে পান সেটার ব্যাপারে কারোই ধারণা ছিল না। থাকার কথাও নয়। প্রতিটি ঘরেই অত্যাধুনিক সব গোপন মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা লাগানো রয়েছে, যেগুলো ওরা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পেত না। অনেক অর্থ উপার্জন করলে তার রক্ষণাবেক্ষণও ঠিকভাবে করতে হয়! এটা জানেন বলেই তিনি এত ব্যয় করে এই ব্যবস্থা করেছেন। আর সেটা যে পুরোপুরি কাজে লেগেছে, তা বলাই বাহুল্য!

তবু রাহাত পিস্তলটা একটা কাজে লাগাতে পেরেছে দেখে তিনি মনে মনে খুশি হলেন। ওকে মুক্ত করার জন্য রিমোটের বোতামে আঙুল বাড়ালেন। সহসা স্পিকারে ভেসে আসা প্রচণ্ড শব্দ তার আঙুল থামিয়ে দিলো। দেখতে পেলেন জলিল ক্রমাগত গুলি করছে। একটা গুলি গিয়ে রাহাতের বুকে আর অন্য একটা গিয়ে ওর পেটে লাগলো। বাকিগুলো ছিটকে গেল এলোপাথারি। রাহাতের শরীরটা মেঝেতে এলিয়ে পড়ল, থর থর করে কেঁপে চলল।

বারেক কালিয়ান উঠে দাঁড়ালেন, নাহ এভাবে ওকে বাইরে যেতে দিলেও ছেলেটা বাঁচবে না, উল্টে গুলিবিদ্ধ দেখলে লোকজন সন্দেহ করবে। পরে খুঁজতে খুঁজতে গোপন কক্ষটি বের করে ফেললে বিস্তর সমস্যা হবে। তার থেকে এখানেই থাক ওর শরীরটা, কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাণ বের হয়ে যাবে।

আর বেশি সময়ও হাতে নেই, স্ত্রী কে পাঠিয়ে দিয়েছেন একাই চিত্র প্রদর্শনিতে, বলেছেন তিনি পরদিন কিছু কাজ সেরে আসবেন, এখনও না গেলে ফ্লাইট ধরতে পারবেন না। কিছুক্ষণ আগে ওদের মিথ্যে বলেছেন অতিরিক্ত হতাশ করতে, প্রদর্শনি আসলে হচ্ছে। তবে তিনি ঘন্টাখানেক থেকেই ফিরতি প্লেন ধরবেন। স্ত্রী

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ওখানেই থাকবে। সে ফেরার আগেই সবটা গুছিয়ে ফেলতে হবে তাকে।

বারেক কালিয়ান মনিটর বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। ওই ঘরে গ্যাস ছাড়ার আয়োজন অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে করতে হয়েছে। গ্যাসটা মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। ওদেরকে মিথ্যে ভয় দেখিয়েছেন। মানুষ যখন কোনও কিছু নিয়ে ভয় পেতে শুরু করে তখন সেটা সম্পর্কিত সব তথ্যকেই সে সত্যি বলে ধরে নেয়। শিল্পীর কথা শুনে, আর গ্যাসের আভাস পেয়ে, বাকি সবটাই ঘরের ভেতরে থাকা লোকগুলি সত্যি বলে ধরে নিয়েছিল। এই বিষয়টা একদম তার পরিকল্পনা মতো হয়েছে!

বারেক কালিয়ান স্বস্তির হাসি হাসলেন।

লুকানো আস্তানার গ্যারেজ থেকে একটা সুদৃশ্য গাড়িতে করে বেরিয়ে এলেন শিল্পী। গাড়ি আজ তিনি নিজেই চালাচ্ছেন, বিদেশে গেলেও অবশ্য তা-ই করেন। এয়ারপোর্টে ঢোকার আগে নির্দিষ্ট পার্কিংয়ে রেখে দেবেন। লাগেজ স্ত্রী'র সাথে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সামান্য হেঁটে এয়ারপোর্টে পৌছাতে সমস্যা হবে না।

গাড়ির জানালা খোলা, ফুরফুরে হওয়া দিচ্ছে বাইরে থেকে। বারেক কালিয়ান ক্যাসেট প্লেয়ারে একটা ধীর গতির ইংরেজি গান লাগিয়ে সেটা উপভোগ করতে করতে ছুটে চললেন এয়ারপোর্টের পথে। দূরন্ত গতিতে, নির্বিঘ্নে।

পরিশেষে

এক বছর পর

বার্লিন, জার্মানি
সকাল ১১:৩১

অনেকক্ষণ ধরে গভিরভাবে একটা ছবির দিকে তাকিয়ে গুনাগুণ বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী বারেক কালিয়ানের আঁকা একটি অনন্য চিত্রকর্ম। ছবিটির মূল বিষয় 'মৃত্যু', প্রেক্ষাপট সীমিত, কিন্তু চরিত্র বহুল। বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে। ক্যানভাসে, এক কোনায় মেঝেতে একজন পুরুষ শুয়ে আছে। তার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বাইরে আসতে চাইছে। মানুষটার বুকের উপর থেকেই বয়ে চলেছে রক্তের ধারা, যেটা ঘরের মাঝামাঝি গিয়ে অপর রক্তের ধারার সাথে মিশেছে। ছেলেটির বুকের উপর থেকে যে রক্তের ধারাটি বয়ে গিয়েছে সেটার উৎপত্তিস্থল এক মেয়ের ছিন্ন ভিন্ন মাথা। মেয়েটা ছেলেটার বুকে মাথা রেখে যেন পরম মমতায় ঘুমিয়ে আছে। পাশ থেকে দেখে ক্ষতবিক্ষত চেহারার উপর দিয়েও বেশ বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা সুশ্রী।

মেয়েটার মাথা থেকে বেরিয়ে রক্তস্রোত ঘরের মাঝামাঝি একটা গোল টেবিলের কাছে গিয়ে যে রক্ত-ধারার সাথে মিশেছে সেটা অন্য এক ছেলের। তবে এই ছেলেটার শরীরের শুধু এক জায়গাতে নয়, বরং তিন জায়গাতে ক্ষত। জখম থেকে বেরিয়ে আসা স্রোতের দুটি একত্রিত হয়ে ছেলেটার মাথার থেকে কিছুটা সামনে এগিয়েছে। তারপর থেমে গেছে অন্য একটি মৃতদেহের কাছে।

এই মৃতদেহটাও এক ব্যক্তির। লাশটার অবস্থা বিদঘুটে, পেট চিরে বড় একটা হা করে রয়েছে, যেন গিলে খেতে চাইছে বাইরে বেরিয়ে আসা নাড়ি-ভুরিগুলো। নাড়িভুরির বেশ কিছু অংশ অবাধে রক্তধারার উপর লুটোপুটি খাচ্ছে। মুক্তির স্বাদ নিচ্ছে।

টেবিলের থেকে সামান্য এগিয়ে আরও একজনকে দেখা গেল, অবশ্য সে জীবিত না মৃত সেটা বোঝা যাচ্ছে না। লোকটার হাতে রিভলভার, পোশাকের ওপর দিয়ে একটা রক্তের ধারা নেমে আসতে দেখা যাচ্ছে একদম মাটিতে। সতর্কভাবে দেখলে বোঝা যায় ধারাটা নেমেছে তার নাকের কাছ থেকে। লোকটার নাক নেই, কংকালের বেরিয়ে রয়েছে। সে বসে আছে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে, দৃষ্টি সামনে স্থির।

BanglaBook.org

হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকা মানুষটার সামনে কেউ নেই। তার প্রতিপক্ষ অদৃশ্য।

টেবিলের অপর পাশে আরও কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে। তিনজন চেয়ারের উপর বসে রয়েছে পাশাপাশি। একজনের বিশাল দেহ, পোশাক বিহীন শরীরের কালো রঙটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। দেখেই মনে হচ্ছে শরীরে অনেক শক্তি, কিন্তু তার চেহারাটা অনুপস্থিত। সেখানে সম্পূর্ণ ভাঙাচোরা অবস্থা, মাথার বিভিন্ন অংশ থেকে মগজ গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে। লোকটার ঘাড় চেয়ারের পেছন দিকে বেঁকে রয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে সেখানে বড় ধরনের বিস্ফোরক দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। লোকটার পায়ে একটা গেঞ্জি বাঁধা, সেটার ভিজে ভাব দেখে অনুমান করা যায় কোনও গভির ক্ষতকে আড়াল করা হয়েছে।

পাশের চেয়ারে একজন বয়স্ক মহিলা রয়েছেন, পড়নের সাদা শাড়ি, রক্তে ভিজে লালে বদলেছে। শাড়ীর বিভিন্ন অংশে টানাটানির চিহ্ন আর ছেঁড়া ফাটার নমুনা স্পষ্ট। শিল্পীর নিপুণ তুলিতে তার ভীত চোখের মৃত্যু ভাষা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বৃদ্ধার পাশে যে বসে আছে তার ঠোঁটের কোনায় এক টুকরো হাসি জ্বলছে। মৃত্যুর সময় সে দারুণ আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে সেটা খুব বেশি মাত্রায় ফুটে উঠেছে। তার প্রতিকৃতিটিই প্রমাণ করে মৃত্যু মাঝে মধ্যে মানুষকে সুখীও করে তুলতে পারে। সম্ভবত সেটাই শিল্পী এই চরিত্রটির মাধ্যমে ছবিতে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

তবে বসে থাকা তিনজনের চেয়ারের পেছনে একটি অসমঞ্জস্যতা দৃষ্টিকটু লাগে। সম্ভবত এই ব্যাপারটির জন্যই ছবিটি গর্বিত বাংলাদেশী হিসেবে শিল্পী বারেক কালিয়ানকে এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জনের মর্যাদা।

চেয়ারের পেছনের অসমঞ্জস্যতাটি হলো একটি কালো ছায়া। মানুষের ছায়া। সেটা সাদা পরিধি দিয়ে ঘেরা, পরিধির আদল ছায়াটিকে ঘিরে আঁকা। ছায়ার মাথার উপরটা জুড়ে বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকা, সাদা রং দিয়ে।

পুরো ছবিটির নাম শিল্পী দিয়েছেন, *The One Who Escaped Death*।

মিটি মিটি হাসলাম। বিদেশ বিভূঁইয়ে পাবলিক প্লেসে জোরে হাসাকে অনেকে অভদ্রতা বলে মনে করে, আর একটা চিত্র প্রদর্শনিতে সেটা অঘোষিত আইন। এই বাঁধা না থাকলে হয়তো অনেক জোরে হাসতাম, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে হাসতাম! হাসাটাই স্বাভাবিক। বিখ্যাত ছবি থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকটি যখন স্বয়ং ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তখন সে হাসতেই পারে, তার হাসাই উচিৎ।

হ্যা, আমি হিরন। আমিই সেই লোক যে এই ছবিটাকে বিখ্যাত করে তুলেছি সেটা থেকে হারিয়ে গিয়ে। সেই একমাত্র লোক, যে বেঁচে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল বারেক কালিয়ানের ভয়ংকর খেলাঘর থেকে।

BanglaBook.org

এখন বুঝতে পারছি তিনি কেন আমাদের ওভাবে বন্দি করেছিলেন। তার ছবি জন্যই তিনি এটা করেছেন। শিল্পীর প্রয়োজন ছিল একটি বিশেষ দৃশ্য, একটি জীবন্ত পটভূমি, যা তিনি সঠিকভাবে কল্পনায় নিয়ে আসতে পারছিলেন না। তার এই জঘন্য উদ্দ্যেশে কেউ জেনে শুনে সঙ্গিও হতে চাইতো না। তাই তিনি এটা করেছিলেন। করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। আর মডেল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন আমাদের মতো কয়েক জন চোরকে, যাদের খবর কেউ রাখে না, যাদের জন্য পরোয়া কেউ করে না, যারা হারিয়ে গেলেও কেউ তাদের খোঁজার চেষ্টা করে দেখবে না। শুধুমাত্র শুমেলের বাবা তাকে কয়েকবার খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন, আর তার ভয়েই আমাকে পালিয়ে শেষে বিদেশে চলে আসতে হয়। তবে আমার ধারণা তিনি বারেক কালিয়ান পর্যন্ত পৌছতে পারেন নি, আমার সাহায্য ছাড়া সেটা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

আমার পালিয়ে আসার ঘটনাটা অবশ্য একটু বেশিই নাটকীয়। আসলে মানুষের ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন থাকে তখন আর তাকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। তবে এর জন্য নিজেকেও কিছুটা বুদ্ধি খাটাতে হয়েছিল। ভাগ্য সহায় না হলে সেটাও করতে পারতাম না।

সেদিন পরিকল্পনামতো আমি কাঁচের টুকরো নিয়ে দ্রুত বুকের উপর বসিয়ে দিয়েছিলাম। চেষ্টা করেছি একদম গভিরে না বসাতে। যে রক্তের ছোপটা আমার গেঞ্জিতে সবাই দেখেছিল, সেটা রান্নাঘর থেকে পিজার উপরে মাখানোর উদ্দ্যেশে সংগ্রহ করা কিছু টমেটো সসের প্যাকেট থেকেই পড়েছে।

ভাগ্যই বটে! রান্না ঘরে যদি ওই গোয়েন্দা পুলিশ না ধরত তাহলে বাসি পিজাটা হয়তো পুরো সস মাখিয়েই খেয়ে ফেলতাম। সেটা কাঁচ দিয়ে কেটে আর নকল রক্ত বের করে মৃত্যুর অভিনয় করার সুযোগ পেতাম না। যদিও কাঁচে কিছুটা ক্ষত হয়েছিল, কিন্তু তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণনাশী কিছু নয়।

প্ল্যান ছিল, সবাই মারামারি করে মরে যাবার পরে আমি উঠে দাঁড়াব, মুক্তি চাইব শিল্পীর কাছে। যদিও এতে সাফল্যের সম্ভাবনা নিতান্তই নগণ্য, কিন্তু একদম শূন্য ছিল না। নিথর হবার কিছুক্ষণ পর বুঝলাম রাহাতও আমার মতো একই পরিকল্পনা করেছিল। পরে সম্ভবত ও মত পরিবর্তন করে নিজের মুক্তি নিজেই ছিনিয়ে নেওয়াটাকে শ্রেয় বলে মনে করেছে। তাই গুলি শুরু করেছিল। তখন ভেবেছিলাম যদি শেষ পর্যন্ত কেউ বেঁচেও যায় তবে আমি তাকে কোনোভাবে হত্যা করে মুক্তি দাবি করব।

কপাল ভাল, মারামারি করে সবাই মরে গেল এক সময়। নিজের হাতে কাউকে

BanglaBook.org

মারতে হয়নি, গায়ে লাগেনি খুনির নিশানা। সবশেষে উঠে মুক্তি দাবি করতে গেলাম, দেখি বারেক কালিয়ান নেই, তার ছবিটা বিদায় হয়েছে!

ততক্ষণে বুঝে ফেলেছিলাম ঘরের গ্যাসটা বিষাক্ত কিছু নয়, সেরকম হলে আরও আগেই মরে যেতাম। সেজন্য মনে কিছুটা সাহস ছিল। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পরেও যখন মুক্তির কোনও উপায় পেলাম না, তখন হতাশ হয়ে আবার গিয়ে মেঝেতে বসে পড়লাম। আর তখনই দেখা দিলো সুপ্রসন্ন ভাগ্যের দ্বিতীয় চমক! আলগোছাভাবে হাত মেঝেতে রাখতেই হাতে ঠেকলো বারেক কালিয়ানের সিন্দুক থেকে উদ্ধার করা সেই চাবিটা। চাবিটা নিচে পড়ে দুই খণ্ড হয়ে গেছিল। ভাঙ্গেনি, মাঝখান থেকে আলাদা হয়েছে। দেখে বোঝা গেল জোড়া লাগানো ছিল। আনমনে দুটো খণ্ড আলাদা আলাদাভাবে হাতে তুলে নিতেই দেখলাম নিচের অর্ধেকটার মধ্যে বিশেষভাবে খাঁজ কেটে একটা চিহ্ন আঁকা রয়েছে। চিহ্নটা দেখেই চিনলাম। টেবিলের উপরে থাকা সেই লকটার মধ্যে একই চিহ্ন আঁকা।

সুতরাং দ্রুত লকের মধ্যে চাবির নিচের অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দিলাম। কয়েকবার মোচড় দিতেই ঘড়ঘড় শব্দে ঘরের শো-কেসটা পুরোপুরি মাটির তলায় চলে গেল। সেটার পেছন থেকেই বেরিয়ে এল পথ।

রাস্তাটা ধরার আগে রঞ্জনের টাকা ভর্তি ব্যাগটা কাঁধে নিলাম। যার জন্য এত কাহিনী করলাম সেই চুরি থেকে কিছুই অর্জন হবে না এটা ভাবতেই বিরক্ত লাগছিল। বারেক কালিয়ান পরে যা করে করবে, সেগুলো নিয়ে তখন ভাবছিলাম না একদম। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা দরজার কাছে পৌঁছলাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দরজাটা বন্ধ ছিল। অন্যদিকে আমার পেছনে ফেরত যাবার রাস্তাটাও এই পথে ঢোকার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেছিল। সেখানে ফেরার উপায় ছিল না।

আমি দরজার লকটা ভালভাবে পরীক্ষা করে বুঝলাম সেটা আসলে সেই পাঁচটা খাঁজ বিশিষ্ট লক যেটা বারেক কালিয়ান এর বাড়ির কন্ট্রোল রুমে ছিল। এখানেও ভাগ্য ফাঁকি দিলো না, চাবির দুটো টুকরোই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। খণ্ডদুটো আবার আগের মতো জুড়ে দিলাম। এরপর চাবিটা লকের লাগিয়ে মোচড় দিতেই মাথার উপর মাটি সরে দু-ভাগ হয়ে গেল।

অনড় দাঁড়িয়ে রইলাম। মেঝেটা প্ল্যাটফর্মের মতো উপরে উঠে গেল। চারপাশে তাকিয়ে বুঝলাম মালির ঘরের পেছন দিয়ে বের হয়েছি।

প্ল্যাটফর্ম থেকে সরে দাঁড়াতেই সেটা নিচে নেমে গেল। মাটির স্তর দু'পাশ দিয়ে আপনা আপনি এসে গর্তটা বুজিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

এদিক ওদিক না দেখে ঝেড়ে দৌড় দিলাম।

দরজার বাইরে এসে টের পেলাম বুকের ক্ষতটা ভালই গভির হয়েছে, শরীরও অনেক দুর্বল। কিন্তু দরজার সামনে যা দেখতে পেলাম তাতে দেহে প্রাণ ফিরে এল। দেখলাম বাইরে গাড়ি দাঁড়া করিয়ে ড্রাইভার মকবুল মিয়া অস্থিরভাবে পায়চারি করছে।

আমাকে দেখে জানাল, তাকে নাকি আব্দুল ফোন দিয়ে খুব করে অনুরোধ করেছিল এখানে আসতে। মকবুলের সাথে আব্দুলের সম্পর্ক ভাল, তাই ফোনটা উপেক্ষা করতে পারেনি। পরে অবশ্য আব্দুলের থেকে জানতে পারি সে তার বউয়ের মোবাইল দিয়ে আমাকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছিল দশটার কাছাকাছি সময়। না পেয়ে চিন্তিত হয়ে ওর এক বন্ধুকে চাপাচাপি করে খবর নিতে পাঠায়। সেই বন্ধু আমাদের বাড়ি খুঁজে তাকে জানায় আমরা তখনও ফিরিনি। শুনে সে ভয় পেয়ে মকবুলের হাতে পায়ে ধরার মতো অনুরোধ করে ফোনে। মকবুল অনেক কষ্টে রাজি হয় এখানে আবার আসতে।

এরপর মকবুল আর আমি দুজনে হাসপাতালে গিয়ে আমার ক্ষতর প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে যে যার বাসাতে চলে গিয়েছিলাম। ডাক্তার কাঁচে কাটা দেখে সন্দেহ করেনি, বলেছি পনির গ্লাস হাতে মেঝেতে পিছলে পড়েছিলাম।

মকবুল আর আব্দুল কে যথার্থভাবে অর্থ দিয়ে খুশি করে দিয়েছি পরবর্তিতে, ওই দিন সাহায্য না পেলে অতটা পথ একা পাড়ি দেওয়া সম্ভব হতো না!

বারেক কালিয়ানের থেকে যে পরিমান টাকা ঝেড়েছিলাম তাতে ঠিকভাবে নেড়ে চেড়ে খেলে দুই পুরুষ শান্তি মতো বাঁচতে পারবে। শুমেলের বাবা, আর শিল্পীর ভয়ে আমি দশ দিনের মধ্যেই দেশ ত্যাগ করি। এক বন্ধুর জার্মানিতে ব্যবসা রয়েছে, গার্মেন্টস এর ব্যবসা, সে-ই নিজের কিছু পরিচিত লিংক ধরে তাড়াতাড়ি টুরিস্ট ভিসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। পরে এখানে এসে আমিও একটা ছোট খাটো ব্যবসা শুরু করে ফেলেছি, হোটেল ব্যবসা। সেজন্য বিশেষ আপীল করে ভিসার ধরনটা পরিবর্তন করতে হয়েছে, ব্যাস। ঠিক ঠাক ট্যাক্স দিয়ে স্বাধীন ব্যবসা করতে চাইলে এখানে কেউ বাঁধা দেয় না।

ব্যবসা ভালই হচ্ছে আজকাল, আমারও চলে যাচ্ছে বেশ। হোটেলটা অবশ্য বার্লিনে না, সেটা জার্মানির 'বন' শহরে। এখানে এসেছি শুধুমাত্র প্রদর্শনি দেখতে, বারেক কালিয়ানের ছবিটার কথা শুনে আর এটাকে ইন্টারনেটে দেখে স্ব-চক্ষে দেখার লোভ সামলাতে পারিনি। ছবিটা প্রদর্শনিতে উঠবে জানতে পেরেই সরাসরি এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট কেটে পাড়ি জমিয়েছি।

BanglaBook.org

যাই হোক, ছবি দেখা শেষ হয়েছে, এখানে আর কোনও কাজ নেই। বারেক কালিয়ান আজ কী করছে কে জানে! হয়তো নিজের নতুন কোনও অসুস্থ ভাবনাকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলার জন্য আনকোরা নৃশংসতার ফন্দি আঁটছে!

সেদিন মালি, দারোয়ান, কিংবা গোয়েন্দা পুলিশ আব্বাসের কী হয়েছে তা-ও জানি না। তবে পত্রিকায় কোনও খবর আসেনি। শিল্পীর অনেক ক্ষমতা, হয়তো কোনও উপায়ে সামলে নিয়েছে। কিংবা, ওদেরকেও পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়েছে। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আজ আমি স্বাধীন, নিশ্চিন্ত। একটা চুরিই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

ফিরতি ট্রেনের প্রায় সময় হয়ে এল, এখনই না বেরুলে সেটা ধরা যাবে না। এখান থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় ২০ মিনিটের পথ সেই স্টেশন। এদেশে কেউ সময়ের এদিক ওদিক করে না, একদম ঘড়ি ধরে ধরে চলে। তাই আর একটুও সময় নষ্ট করা উচিৎ হবে না।

অতঃপর, *The One Who Escaped Death*, ছবি সমাহার থেকে বেরিয়ে স্টেশনের পথে পা বাড়াল।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG